গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা

জেলা তথ্য ঃ বাগেরহাট

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন
এবং
এ. বি. এম. সিদ্দিকুর রহমান

জানুয়ারি, ২০০৫

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস
সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রকল্প

জেলা তথ্য :
বাগেরহাট

প্রকাশকাল :
জানুয়ারি, ২০০৫

প্রকাশনায় :
পিডিও-আইসিজেডএমপি
সায়মন সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ী : ৪এ, রোড : ২২
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২
ফোন : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪, ৯৮৯২৭৮৭
ফ্যাক্স : (৮৮০-২) ৮৮২৬৬১৪
ই-মেইল : pdo@iczmpbd.org
ওয়েবসাইট : www.iczmpbangladesh.org
ও
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)
বাড়ি : ১০৩, রোড : ০১
বনানী, ঢাকা ১২১৩।

প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অফিস - সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (পিডিও-আইসিজেডএমপি) বাংলাদেশ, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত একটি বহুখাতভিত্তিক এবং বহুপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক উদ্যোগ, যেখানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হচ্ছে মূল মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) মূল সংস্থা।

মুদ্রন সহযোগিতায় :

ISBN :

তথ্যের প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষমতায়নের একটি প্রয়াস
জেলা তথ্য : বাগেরহাট

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি অন্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। একদিকে প্রকৃতির অপার সম্পদ অন্যদিকে প্রকৃতির বিরূপতার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ অঞ্চলের ১৯টি জেলার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এ লক্ষ্যে পিডিও-আইসিজেডএমপি প্রকল্প একটি নীতিমালার খসড়া প্রস্তুত ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছে। কর্মকৌশলগুলোর ভিত্তিতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। উন্নয়ন কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ কার্যকরি করতে উপকূলীয় অঞ্চলের ১৯টি জেলার প্রতিটির জন্য একটি করে তথ্য বই লেখা হয়েছে যাতে করে জেলার জনগণ স্ব-স্ব জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারবে।

আবু মোস্তফা কামাল উদ্দিন এবং এ.বি.এম. সিদ্দিকুর রহমান যৌথভাবে এই বইটি লিখেছেন। অন্যান্য যারা এই বই লিখতে বিভিন্ন সময়ে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন মহিউদ্দিন আহমদ, ড. মোঃ লিয়াকত আলী ও মুহাম্মদ শওকত ওসমান। অক্ষর বিন্যাস ও লে- আউটে সহযোগিতা করেছেন মোঃ নুরুজ্জামান মিয়া।

বইটির পর্যালোচনাসহ মতামত দিয়েছেন পিডিও ও ওয়ারপো-র বিশেষজ্ঞ বৃন্দ। এ ছাড়া বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ মতামত দিয়ে বইটিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

ড. এম. রফিকুল ইসলাম বইটি লিখতে সার্বিক পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জেলাভিত্তিক। ঐতিহ্যগতভাবেই মানুষের জেলাভিত্তিক পরিচয় আছে। অপরদিকে জেলাগুলোরও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রও জেলা। অন্যদিকে উপকূলীয় জীবনমানের উন্নয়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার নীতিগত সিদ্ধান্ত উপকূলীয় অঞ্চলের নীতিমালায় রয়েছে।

সমন্বিত উপকূল অঞ্চল ব্যবস্থাপনার মূল নীতি হল জনগণের অংশগ্রহণে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। উপকূলীয় অঞ্চল উন্নয়নে জেলাভিত্তিক উদ্যোগকে কার্যকর করতে প্রয়োজন জেলার জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই জেলার জনগণকে তাদের নিজ নিজ জেলার অবস্থা, অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য জেলাভিত্তিক এই বই লেখা হয়েছে। উপকূলীয় ১৯টি জেলার জন্য আলাদা আলাদা বই লেখা ও প্রচার করা হচ্ছে।

এই বইটি লেখা হয়েছে বাগেরহাট জেলার জনগণকে উন্নয়ন কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট করার জন্য। এতে রয়েছে জেলার প্রাকৃতিক সম্পদের বর্ণনা, ভৌত ও মানব সম্পদের বর্ণনা এবং ভবিষ্যতে এ সম্পদের অবস্থা কি হতে পারে সেই বর্ণনা।

এই বই-এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে 'সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা' এবং 'সম্ভাবনা ও সুযোগ'-এর উপর বিশদ বর্ণনা। এই বর্ণনার তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে অন্যান্য অংশে। তাই জেলার সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো জেনে নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় আগ্রহ সৃষ্টি ও অবদান রাখতে এই বই জনগণ তথা উন্নয়ন অংশীদারদের সাহায্য করবে।

তা ছাড়াও 'উপকূলীয় উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ' আলোচনা এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহায়ক আলোচনায় এই বই সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করি।

এই বইয়ের জন্য তথ্য নেয়া হয়েছে প্রধানত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বি.বি.এস.)- এর বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এর পরেই সবচেয়ে বেশি তথ্য এসেছে প্রকল্পের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে। এ ছাড়াও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ আবহাওয়া পরিদপ্তর থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে।

সাহায্য নেয়া হয়েছে বাগেরহাটের উপর লিখিত বিভিন্ন বই থেকে -

১। ড. শেখ গাউস মিয়া, ২০০১। বাগেরহাটের ইতিহাস। বেলায়েত হোসেন ফাউন্ডেশন, বাগেরহাট। বাগেরহাট, জুলাই, ২০০১।

২। নারায়ণ চন্দ্র পাল, ২০০৩। বাগেরহাটের ইতিহাস ও সাহিত্য সংস্কৃতি। বাণীপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৩।

৩। বি.বি.এস., ২০০৩। কৃষি শুমারী ১৯৯৬ঃ জেলা সিরিজ বাগেরহাট। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ঢাকা, এপ্রিল ২০০৩।

৪। ওয়াজেদ, আবদুল, ২০০২। বাংলাদেশের নদীমালা। পালক পাবলিশার্স। ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০২।

৫। PDO-ICZMP, 2001.Inventory of Coastal & Estuarine Island & Char lands (Draft Report), Program Development Office for Intergrated Coastal Zone Management Plan Project, Bangladesh, Dhaka, August 2001.

৬। CEGIS, 2004, Vulnerability Analysis of Major Livelihood Groups in the Coastal Zone of Bangladesh. Final Report. Centre for Environmental and Geographic Information Services, Dhaka, May 2004.

৭। K. G. M. Latiful Bari, 1978, Bangladesh District Gajetteers Khulna. Establishment Division, Government of the People’s Republic of Bangladesh, Dhaka, December 1978.

তথ্য নেয়া হয়েছে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বাগেরহাট জেলার উপর প্রকাশিত সংবাদ ও নিবন্ধ থেকে।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ
জেলা মানচিত্র

সূচনা	**১-৫**
এক নজরে বাগের হাট	২
জেলার অবস্থান	৩
উপজেলা তথ্য সারণী	৪
প্রকৃতি ও পরিবেশ	**৭-১৯**
প্রাকৃতিক পরিবেশ	৭
বনজ সম্পদ	১১
খনিজ সম্পদ	১২
কৃষি সম্পদ	১৩
মৎস্য সম্পদ	১৩
পশু সম্পদ	১৪
দুর্যোগ	১৫
বিপদাপন্নতা	১৯
জীবন ও জীবিকা	**২১-২৪**
জনসংখ্যা	২১
জনস্বাস্থ্য	২১
শিক্ষা	২২
অভিবাসন	২২
সামাজিক উন্নয়ন	২২
প্রধান জীবিকা দল	২২
অর্থনৈতিক অবস্থা	২৩
দারিদ্র্য	২৩
নারীদের অবস্থান	**২৫-২৬**
অবকাঠামো	**২৭-২৯**
রাস্তা-**ঘাট** ও নৌপথ	২৭
পোল্ডার	২৭
ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র	২৭
হাট-বাজার ও বন্দর	২৭
মংলা বন্দর	২৮
বিদ্যুৎ/টেলিযোগাযোগ	২৮
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২৮
স্বাস্থ্য ব্যবস্থা	২৮
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান	২৮
শিল্পাঞ্চল	২৮
হোটেল/অবকাশ কেন্দ্র	২৯
সেচ ও গুদাম	২৯
উন্নয়ন প্রকল্প	২৯
সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা	**৩১-৩৪**
পরিবেশগত সমস্যা	৩১
আর্থ-সামাজিক সমস্যা	৩৩
পর্যটন বিষয়ক সমস্যা	৩৩
যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা	৩৩
সম্ভাবনা ও সুযোগ	**৩৫-৩৮**
প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহার	৩৫
কৃষি উন্নয়ন	৩৬
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	৩৬
শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	৩৭
ভবিষ্যতের রূপরেখা	**৩৯**
দর্শনীয় স্থান	**৪১-৪২**

জেলা মানচিত্র

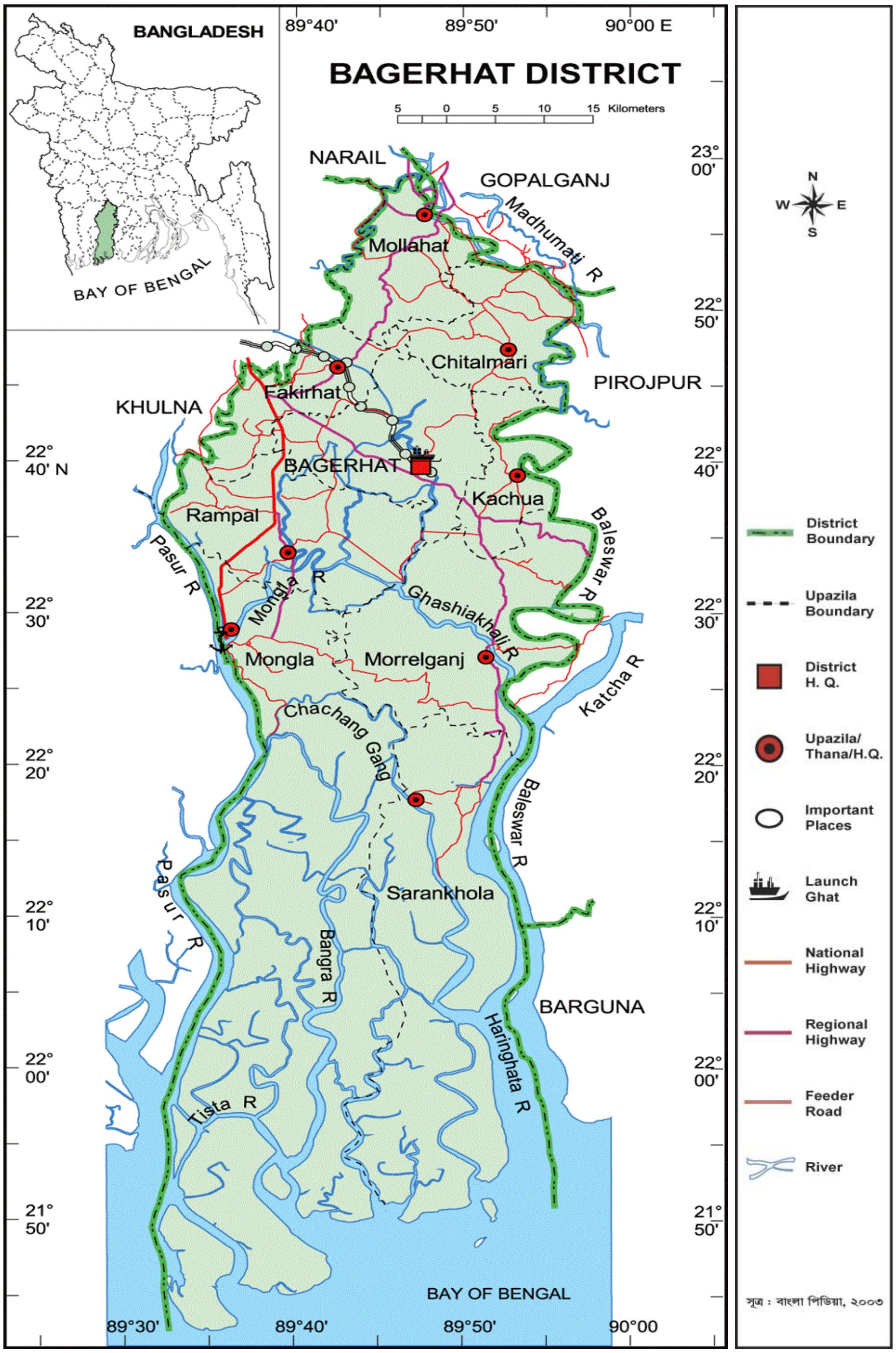
BANGLADESH
BAY OF BENGAL
BAGERHAT DISTRICT
5 0 5 10 15 Kilometers
89°40'
89°50'
90°00 E
NARAIL
GOPALGANJ
Madhumati R
Mollahat
Chitalmari
Fakirhat
PIROJPUR
KHULNA
BAGERHAT
Kachua
Rampal
Baleswar R
Pasur R
Mongla R
Ghashiakhali R
Mongla
Morrelganj
Katcha R
Chachang Gang
Baleswar R
Sarankhola
Pasur R
Bangra R
BARGUNA
Haringhata R
Tista R
BAY OF BENGAL
89°30'
89°40'
89°50'
90°00
23° 00'
22° 50'
22° 40' N
22° 40'
22° 30'
22° 20'
22° 10'
22° 00'
21° 50'
N
W
E
S
District Boundary
Upazila Boundary
District H. Q.
Upazila/ Thana/H.Q.
Important Places
Launch Ghat
National Highway
Regional Highway
Feeder Road
River
সূত্র : বাংলা পিডিয়া, ২০০৩

সূচনা

বিস্তীর্ণ সবুজ ফসলের মাঠ, গাছ-গাছালি, নদী-নালা, খাল-বিল, বনভূমি ও সমুদ্র নিয়ে এক অপার সৌন্দর্যমণ্ডিত জেলা বাগেরহাট। এখানে রয়েছে ৭ম থেকে ১৫শ শতকের বহু গুরুত্বপূর্ণ জনপদের চিহ্ন। এই জেলায় রয়েছে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর মংলা, বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের একাংশ, বিখ্যাত সাধক খান জাহান আলীর মাজার এবং বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান ষাট গম্বুজ মসজিদ। দেশের দ্বিতীয় সমুদ্র বন্দর মংলা এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে জেলায় ব্যাপক শিল্প কারখানা গড়ে উঠছে। পাক-ভারত বিভক্তির পরে এই সমুদ্র বন্দরের গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং পাশের জেলা খুলনার সাথে সাথে বাগেরহাটেও কল-কারখানা গড়ে উঠে।

এই জেলার পূর্বে বলেশ্বর/হরিণঘাটা আর পশ্চিমে পশুর নদী পিরোজপুর এবং খুলনা জেলার সাথে বাগেরহাটের সীমানা নির্দেশ করে। আর উত্তরে গোপালগঞ্জ জেলা ও দক্ষিণে সুন্দরবনের পর বঙ্গোপসাগর। বাগেরহাট জেলা ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত গুপ্ত রাজ্যের সম্রাট সমুদ্রগপ্তের (৩৪০-৩৮০ খৃ:) এবং তার বংশধরদের অধীনে ছিল। এর পরে ৭ম শতাব্দীতে গৌড়ের শাসক শশাংক এই এলাকা দখল করেন। পর্যায়ক্রমে হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজ-রাজাদের শাসনাধীনে থাকার পর ১৫শ শতকের চল্লিশের দশকে বিখ্যাত সুশাসক খান জাহান আলী শাসনভার গ্রহণ করেন। এরপর ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত মোঘল শাসনামলের পর এই এলাকা ইংরেজ শাসনাধীনে আসে।

১৮ম শতাব্দীর শেষের দিকে বাহু বেগম নামে একজন মুসলিম মহিলা মুর্শিদাবাদের নওয়াবদের নিকট থেকে খলিফাবাদ পরগনার অংশ হিসেবে বাগেরহাট জায়েগীর নেন। তার মৃত্যুর পরে এই জায়েগীর শেষ হয়ে যায়। তবে এই সময়কার জনপদের চিহ্ন এখনও রয়েছে। ১৮৪২ সালে যশোর জেলার খুলনা মহকুমার অধীনে বাগেরহাট একটি থানা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কবি বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সুপারিশে ১৮৬৩ সালে একই জেলার অধীনে বাগেরহাট মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বাগেরহাট জেলায় রূপান্তরিত হয়।

এই জেলার নামকরণের নির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে জনশ্রুতি আছে যে, ভৈরব নদীর বাঁকে স্থাপিত হাটের নাম অনুসারে "বাগেরহাট" হতে পারে। আবার এও জনশ্রুতি আছে যে, এক সময় এখানে প্রচুর জঙ্গল ছিল এবং তার মধ্যে প্রচুর বাঘ বসবাস করতো বলে নাম হয়েছে বাগেরহাট। আবার কেউ বলছেন যে, বকর নামে একজন মুসলমান এখানে একটি হাট প্রতিষ্ঠা করেন বলে তার নামানুসারে এই স্থানের নাম হয়েছে বাগেরহাট। আবার কারো মতে এক সময়কার শাসক আগা বাকের খাঁর নামানুসারে বাগেরহাট নাম হয়েছে ।

বাগেরহাট জেলার মোট আয়তন ৩,৯৫৯ বর্গ কিলোমিটার, যা সমগ্র বাংলাদেশের আয়তনের ২.৬৮% এবং সব জেলার মধ্যে ৬ষ্ঠ স্থানে। উপকূলীয় ১৯টি জেলার মধ্যে বাগেরহাট আয়তনে ৩য় স্থানে। বর্তমানে বাগেরহাটে জেলায় ৯টি উপজেলা, ৩টি পৌরসভা, ৭৭টি ইউনিয়ন, ১,০৩১টি গ্রাম, ৭৭৪টি মৌজা/মহল্লা এবং ২৭টি ওয়ার্ড রয়েছে। চিতলমারি, ফকিরহাট, কচুয়া, মোল্লারহাট, মংলা, মোরেলগঞ্জ, রামপাল, বাগেরহাট সদর ও শরনখোলা জেলার ৯টি উপজেলা।

উপজেলা	**৯**
পৌরসভা	**৩**
ইউনিয়ন/ওয়ার্ড	**১০৪**
মৌজা/মহল্লা	**৭৭৪**
গ্রাম	**১০৩১**

প্রাকৃতিক প্রভাব ও ভৌগোলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে উপকূলীয় এলাকা দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন তীরবর্তী (Exposed Coast) এবং অন্তর্বর্তী (Interior Coast) উপকূলীয় এলাকা। এই জেলার উপজেলাগুলোর মাটি, ভূ-গর্ভস্থ পানি ও ভূ-উপরিভাগের পানিতে কতটুকু লবণাক্ততা আছে এবং সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের ঝুঁকি কতটুকু তার ওপর ভিত্তি করে জেলার শরনখোলা, মংলা ও মোরেলগঞ্জকে তীরবর্তী (Exposed Coast) এবং বাগেরহাট সদর, কচুয়া, রামপাল, চিতলমারি, মোল্লাহাট, ফকিরহাট উপজেলাকে অন্তর্বর্তী (Interior Coast) উপকূলীয় এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এক নজরে বাগেরহাট

বিষয়		একক	বাগেরহাট	উপকূলীয় অঞ্চল	বাংলাদেশ	তথ্য সূত্র ও বছর
এলাকা / প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	৩,৯৫৯	৪৭,২০১	১,৪৭,৫৭০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	উপজেলা	সংখ্যা	৯	১৪৭	৫০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ইউনিয়ন	সংখ্যা	৭৭	১,৩৫১	৪,৪৮৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পৌরসভা	সংখ্যা	৩	৭০	২২৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	ওয়ার্ড	সংখ্যা	২৭	৭৪৩	২,৪০৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৭৭৪	১৪,৬৩৬	৬৭,০৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গ্রাম	সংখ্যা	১,০৩১	১৭,৬১৮	৮৭,৯২৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	১৫.১৬	৩৫০.৭৮	১২৩৮.৫১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	লাখ	৭.৮৬	১৭৯.৪২	৬৩৮.৯৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	লাখ	৭.৩০	১৭১.৩৫	৫৯৯.৫৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	বর্গ কি.মি.	৩৮৩	৭৪৩	৮৩৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০০:১০৮	১০০:১০৫	১০০:১০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির আকার	গৃহ প্রতি জনসংখ্যা	৪.৭	৫.১	৪.৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	৩.২২	৬৮.৪৯	২৫৩.০৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী প্রধান গৃহ	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	২	৩.৪৪	৩.৫	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪৪	৪৭	৪২	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২৭	৫০	৫৪	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২১	৩১	৩১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	প্রাথমিক স্কুল	সংখ্যা / ১০,০০০ জন	৯	৭	৬	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	রাস্তার ঘনত্ব	কি.মি./বর্গ কি.মি.	০.৫৪	০.৭৬	০.৭২	বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬ ও বি.বি.এস.,২০০৩
	বাজারের ঘনত্ব	বর্গ কি.মি. / সংখ্যা	১০২	৮০	৭০	১৯৯৬ (বিশ্ব ব্যাংক, ১৯৯৬)
অর্থনীতি	মোট আয়	কোটি টাকা	২,৯০২	৬৭,৮৮০	২,৩৭,০৭৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	মাথাপিছু আয়	টাকা	১৬,৮৩৯	১৮,১৯৮	১৮,২৬৯	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মক্ষম শ্রম শক্তি (১৫ বছর$^{+}$)	হাজার	৮১৯	১৭,৪১৮	৫৩,৫১৪	১৯৯৯/২০০০(বি.বি.এস.,২০০২)
	কর্মরত নারী (খাদ্য বা অর্থের বিনিময়ে)	% (১৫-৪৯ বয়সদল)	৩০	২৬	২৮	২০০১ (নির্পোর্ট, ২০০৩)
	কৃষি শ্রমিক	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	৩৬	৩৩	৩৬	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	জেলে	গ্রামীণ গৃহস্থের (%)	১২	১৪	৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ	হেক্টর	০.০৯	০.০৬	০.০৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
	দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	৬৯	৫২	৪৯	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
	অতি দারিদ্র	মোট গৃহস্থের (%)	৩৭	২৪	২৩	১৯৯৮(বি.বি.এস.,২০০২)
শিক্ষা	প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু(%)	৯৮	৯৫	৯৭	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
	সাক্ষরতার হার (৭ বছর$^{+}$)	মোট জনসংখ্যা (%)	৫৮	৫১	৪৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৬০	৫৪	৫০	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৫৬	৪৭	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	সাক্ষরতার হার (১৫ বছর$^{+}$)	মোট জনসংখ্যা (%)	৬১	৫৭	৪৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	পুরুষ	%	৬৪	৬১	৫৪	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নারী	%	৫৭	৪৯	৪১	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
স্বাস্থ্য	গ্রামীণ পানি সরবরাহ (সক্রিয় টিউবওয়েল)	প্রতি গড় জনসংখ্যা	৯১	১১১	১১৫	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই., ২০০৩)
	কল অথবা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৬২.৩	৮৮	৯১	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৫৬	৪৬	৩৭	২০০১(বি.বি.এস., ২০০৩)
	হাসপাতালে শয্যাপ্রতি জনসংখ্যা (সরকারি)	জন/শয্যা	৪৪৬৫	৪,৬৩৭	৪,২৭৬	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	নবজাতক মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৫৬	৫১-৬৮	৪৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
	<৫ বছর শিশু মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	৮৭	৮০-১০৩	৯০	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	অতি অপুষ্টির হার	%	৪	৬	৫	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	ছেলে	%	৩	৪	৪	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মেয়ে	%	৫	৮	৬	২০০০ (বি.বি.এস. ও ইউনিসেফ, ২০০১)
	মাতৃ মৃত্যুর হার	প্রতি হাজারে	-	৫	৫	১৯৯৮/৯৯ (স্বাস্থসেবা অধিদপ্তর, ২০০০)
	আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহণকারী নারী	%	৪৫	৪১	৪৪	২০০১ (নির্পোর্ট, ২০০৩)

জেলার অবস্থান

জাতীয় অবস্থার তুলনায় ভাল দিক

- জেলার বার্ষিক আয় প্রবৃদ্ধির হার (৬.১%) জাতীয় (৫.৪%) ও উপকূলীয় (৫.৪%) অঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি।
- জেলায় সার্বিক সাক্ষরতা হার (৫৮%) জাতীয় (৪৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫১%) হারের চেয়ে বেশি।
- প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৩৮৩ জন, যা জাতীয় (৮৩৯ জন) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৭৪৩) তুলনায় কম।
- জেলায় ভূমিহীনের সংখ্যা (৪৯.৩%) জাতীয় (৫২.৬%) এবং উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় (৫৩.৫%) কম।
- জেলার ৫৬% গৃহে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধা আছে, যা জাতীয় (৩৭%) ও উপকূলীয় হারের (৪৬%) তুলনায় অনেক বেশি।
- নিম্ন মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতা ।

জাতীয় অবস্থার তুলনায় দুর্বল দিক

- জেলার মোট গৃহের ৬২% কল বা নলকূপের পানির সুবিধাপ্রাপ্ত, যা জাতীয় (৯১%) ও উপকূলীয় (৮৮%) হারের তুলনায় কম।
- জেলায় রাস্তার ঘনত্ব (০.৫৪ কি.মি./বর্গ কি.মি.) জাতীয় (০.৭২ কি.মি. /বর্গ কি.মি.) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (০.৭৬ কি.মি./বর্গ কি.মি.) তুলনায় অনেক কম।
- দৈনন্দিন খাদ্যের পুষ্টিমানের ভিত্তিতে জেলায় দারিদ্র্যপীড়িত ও অতি দরিদ্র গৃহস্থালির সংখ্যা (৬৯%, ৩৭%) জাতীয় (৪৯%, ২৩%) এবং উপকূলীয় (৫২%, ২৪%) অঞ্চলের তুলনায় বেশি।
- মাথাপিছু আয় (১৬,৮৩৯ টাকা) জাতীয় (১৮,২৬৯ টাকা) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (১৮,১৯৮ টাকা) আয়ের তুলনায় কম।
- জেলার মোট আয়ে শিল্পখাতের অবদান ১৪%, যা জাতীয় (২৫%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের হারের (২২%) তুলনায় কম।
- হাসপাতালে শয্যা প্রতি জনসংখ্যা ৪৪৬৫ জন, যা জাতীয় (৪,২৭৬) হারের তুলনায় বেশি।
- জেলায় ২১% গৃহে বিদ্যুৎ সংযোগ আছে, যা জাতীয় (৩১%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৩১%) তুলনায় কম।
- ক্ষুদ্র কৃষকের সংখ্যা (৫৯%) জাতীয় (৫৩%) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৫৮%) তুলনায় বেশি।
- জেলার গড়ে প্রতি ১০২ বর্গ কি. মি. এলাকাতে একটি হাট-বাজার কেন্দ্র আছে, যা জাতীয় (৭০ বর্গ কি. মি. এ একটি) ও উপকূলীয় অঞ্চলের (৮০ বর্গ কি. মি. এ একটি) তুলনায় অপ্রতুল।
- জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে ৫৬) জাতীয় হারের (প্রতি হাজারে ৪৩) তুলনায় অনেক বেশি।
- জেলায় শহুরে জনসংখ্যা ১৬%, যা জাতীয় (২৩%) ও উপকূলীয় হারের (২৩%) তুলনায় অনেক কম।
- জেলার ২% প্রত্যন্ত অঞ্চল বা চর দ্বীপ।

উপজেলা তথ্য সারণী

বিষয়		একক	বাগেরহাট	উপজেলা				
				চিতলমারি	ফকিরহাট	কচুয়া	মোল্লারহাট	মংলা
এলাকা/ প্রশাসনিক	এলাকা	বর্গ কি.মি.	৩৯৫৯	১৯২	১৬১	১৩২	১৮৮	১৪৬১
	ইউনিয়ন/ ওয়ার্ড	সংখ্যা	১০৪	৭	৮	৭	৭	১৬
	মৌজা / মহল্লা	সংখ্যা	৭৭৪	৫৬	৬৭	৮০	৫৯	৪২
	গ্রাম	সংখ্যা	১০৩১	১২২	৮৭	১০১	১০২	৭৭
জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যা	লাখ	১৫.১৬	১.৩৯	১.৩০	০.৯৬	১.১৮	১.৪৯
	পুরুষ	লাখ	৭.৮৬	০.৭২	০.৬৮	০.৪৮	০.৬১	০.৭৯
	নারী	লাখ	৭.৩০	০.৬৭	০.৬২	০.৪৭	০.৫৭	০.৬৯
	জনসংখ্যার ঘনত্ব	জন/বর্গ কি.মি.	৩৮৩	৭২৬	৮১৪	৭৩০	৬৩১	১০২
	লিঙ্গ অনুপাত	অনুপাত	১০৮	১০৮	১০৯	১০৩	১০৭	১১৫
	গৃহস্থালির মোট সংখ্যা	লাখ	৩.২২	০.২৭	০.২৮	০.২.০	০.২২	০.৩২
	গৃহস্থালির আকার	জন/গৃহস্থালি	৪.৭	৫.০৩	৪.৫৪	৪.৬০	৫.১৬	৪.৫৩
	নারী প্রধান গৃহ	মোট গ্রামীণ কৃষিজীবী ঘরের%	২	২.১	৩.৭	২.৭	১.৩	৩.০
ভৌত অবকাঠামো	টেকসই দেয়ালসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৪৪	৩২	৪৭	৫৫	২৩	৩০
	টেকসই ছাদসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	২৭	৩৯	৩৫	২৮	৪৮	১৪
	বিদ্যুৎ সংযোগসম্পন্ন ঘর	মোট গৃহস্থের (%)	৮	২.২৮	৬.৭৮	৪.৫৩	৬.১৭	২০.০৪
	প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	১৩৪৩	১২০	১০৭	১০৮	১০৯	৯৩
	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	২৮৮	২১	৩৩	১৮	২১	২৩
	মহাবিদ্যালয়	মোট সংখ্যা	২৯	২	৩	২	২	৪
অর্থনীতি	কৃষি শ্রমিক	মোট গৃহস্থের (%)	৩৬	৩০	২৩	৩০	২৪	৩৫
	কৃষি প্রধান পরিবার	মোট গৃহস্থের (%)	৭৬	৭৯	৭৯	৮১	৭৫	৭১
	অকৃষি প্রধান পরিবার	মোট গৃহস্থের (%)	২৪	২১	২১	১৯	২৫	২৯
	মোট চাষের জমি	হেক্টর	১২৯৪৩৬	১১,৪৫৩	১১,৬৭০	৮,৫৫৯	১১,১৮১	৯,৭৪৩
	এক ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৯৫	১১	৬৪	৪৮	৩৫	৯৯
	দো ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	৩	৪৯	৩০	৪৮	৪৭	০.৮৬
	তিন ফসলী	মোট কৃষি জমির (%)	২	৪০	৬	৩	১৮	০.১১
	প্রতি ০.০১ হেক্টর জমির মূল্য	টাকা	৫০০০	৫,০০০	৬,০০০	৫,০০০	৫,০০০	২,০০০
শিক্ষা	সাক্ষরতার হার (৭ বছর$^+$)	মোট জনসংখ্যা (%)	৫৮	৬১	৫৫	৬২	৪৩	৫১
	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার	৬-১০ বছর শিশু (%)	৯৮	৮৮	৯৫	১০৮	১০৩	৮৯
	মেয়ে	৬-১০ বছর শিশু (%)	৯৮	৯১	৯৬	১০৯	১০৩	৮৯
স্বাস্থ্য	সক্রিয় টিউবওয়েল	সংখ্যা	১৬৬২৪	১,৮৭৩	২,৫০১	১,৫৪৭	১,৭৭১	২৯৫
	নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	%	৫০	৭৪	৯৫	৬১	৮০	১৮
	স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানার সুবিধাপ্রাপ্ত ঘর	%	১২	৭	১১	১৭	৯	১১

উপজেলা				তথ্য সূত্র ও বছর
মোরেলগঞ্জ	রামপাল	সদর	শরনখোলা	
৪৬১	৩৩৫	২৭৩	৭৫৭	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
২৫	১০	১৯	৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১৩২	১১৮	২০৮	১২	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১৮১	১৩৩	১৮৩	৪৫	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৩.৪০	১.৭৬	২.৫৪	১.১২	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১.৭০	০.৯৩	১.৩২	০.৫৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১.৬৯	০.৮২	১.২২	০.৫২	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৭৩৮	৫২৫	৯৩৪	১৪৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১০১	১১৪	১০৮	১১৩	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
০.৭৩	০.৩৮	০.৫৫	০.২২	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
৪.৬৫	৪.৬৩	৪.৬২	৫.০৯	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
২.৫	২.৭	৩.৭	২.৭	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৫০	৪০	৫১	৫০	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
২১	১৮	৩৬	১৭	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৪.৩০	২.৯৩	১৫.৫৬	৭.৯২	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
৩৩৪	১৪৪	১৮৮	১৪০	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
৬০	৪৭	৪৭	১৮	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
৫	৩	৫	৩	২০০২ (ব্যানবেইস, ২০০৩)
৩১	৩১	২৯	২১	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৭৬	৭২	৭৭	৭২	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
২৪	২৮	২৩	২৮	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৩০,৪৭৩	১৬,৪৬০	২০,৮০৪	৯,০৯১	১৯৯৬(বি.বি.এস.,১৯৯৯)
৭৩	৪৩	৫৬	৫৩	বাংলা পিডিয়া, ২০০১
১৫	৩৬	৩৮	২৭	বাংলা পিডিয়া, ২০০১
১২	২১	৬	২০	বাংলা পিডিয়া, ২০০১
২,০০০	৫,০০০	৫,০০০	২,৫০০	বাংলা পিডিয়া, ২০০১
৬৪	৫৭	৬০	৫৮	২০০১(বি.বি.এস.,২০০৩)
১০২	৯৯	৯৩	১০৩	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
১০৩	৯৮	৯৪	১০৩	২০০১(প্রা.শি.অ, ২০০৩)
২,৬৭২	১,৭৬০	৩,১৭২	১,০৩৩	২০০২ (ডি.পি.এইচ.ই, ২০০৩)
২৫	২৮	৬৯	৩১	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)
১২	৪	২০	১১	১৯৯১(বি.বি.এস.,১৯৯৪)

প্রকৃতি ও পরিবেশ

একদিকে সুন্দরবন, জোয়ার-ভাটার জলাভূমি, নদী-নালা খাল-বিল, মোহনা ও চরাঞ্চল এবং অন্যদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ- বাগেরহাট জেলাকে উপকূলীয় অঞ্চলে স্বতন্ত্র করে তুলেছে। জেলার কৃষি ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। এখানকার কৃষির ধরণ গড়ে উঠেছে ভূমি বৈচিত্র্য ও পানি-মাটির লবণাক্ততাকে কেন্দ্র করে। এই জেলা কৃষি নির্ভর। জেলার একদিকে প্রাকৃতিক বনভূমি, অন্যদিকে ফলজ গাছ-গাছালি আর ফসলের মাঠ।

পদ্মা, গড়াই, মধুমতি ও ভৈরব নদীর অববাহীকায় গাঙ্গেয় পলি আর সমুদ্রের পলি মাটিতে গড়া এই জেলা। জেলার দক্ষিণে লবণ পানি, আর উত্তরে মিঠা পানির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে জেলার প্রকৃতি। প্রাকৃতিক জোয়ার-ভাটার কারণে ভূমির উর্বরতা অনেক বেশি। অত্যন্ত সহজ উপায়ে এবং স্বল্প শ্রমে জন্মায় লতা-গুল্ম, ফুল, ফল, শস্য ও বৃক্ষ।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

জলবায়ু : বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মত বাগেরহাট জেলাও ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুর অন্তর্গত। এখানে ষড়ঋতুর মধ্যে প্রধানত তিনটি মৌসুম জোরালোভাবে পরিলক্ষিত হয়। বর্ষা মৌসুম সাধারণত মে হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বছরের ৯০% বর্ষণ এ সময় হয়। শীতকাল আরম্ভ হয় নভেম্বরে এবং শেষ হয় ফেব্রুয়ারি মাসে। এখানে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের চেয়ে শীতকাল প্রায় ১৫ দিন পরে শুরু হয় এবং ১৫ দিন আগে শেষ হয়। শীত মৌসুম অত্যন্ত শুষ্ক ও শীতল, কখনও কখনও সামান্য বৃষ্টি হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসকে গ্রীষ্ম বা প্রাক বর্ষাকাল বলে গণ্য করা হয়। এ সময় বাতাস খুবই উত্তপ্ত হয় এবং বাতাসে জ্বলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুবই কম থাকে। মাঝে মাঝে বর্ষণসহ প্রবল বেগে বাতাস বইতে থাকে, যাকে 'কালবৈশাখী' বলা হয়। এ সময় কিছু শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে।

এখানে নিম্নতম তাপমাত্রা ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে পরিলক্ষিত হয়, যার গড় প্রায় ২০.৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ৪০ ডিগ্রী সেলসিয়সের বেশি তাপমাত্রা এপ্রিল বা মে মাসে হয়। চরম উষ্ণ তাপমাত্রা মে মাসে ৪১.৭ ডিগ্রী এবং চরম শীতল তাপমাত্রা জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে ৭.২ ডিগ্রী সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। শীতকালে গড় বৃষ্টিপাত ৬৫ মিলিমিটার, যা ঐ সময়ে বাষ্পীভবনের পরিমাণের চেয়ে অনেক কম। নভেম্বর মাস হতে মার্চ মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের মাসিক হার ৭৫ মিলিমিটারের কম বলে এ মাসগুলোকে শুষ্ক মাস বলা চলে।

মাটি : বাগেরহাট জেলায় বিভিন্ন জায়গার মাটিতে ভিন্নতা রয়েছে। জেলায় মূলত তিন ধরনের মাটি দেখতে পাওয়া যায়। বাদামী কালো পীট, গাঢ় ধূসর কাদামাটি এবং ধূসর পলিযুক্ত কাদামটি। জেলার উত্তরাংশের মাটি বাদামী কালো পীট ধরনের। জেলার মধ্যভাগে পুরনো গাঙ্গেয় জোয়ার-ভাটার বা বন্যাপ্লাবন এলাকার মাটি লবণাক্ত, গাঢ় ধূসর এঁটেলযুক্ত। অন্যদিকে, দক্ষিণাঞ্চলে সালফেটযুক্ত ধূসর পলিময় কাদামাটির আধিক্য দেখা যায়। নদীর তীরবর্তী এলাকা ও বেসিন এলাকার মাটি এঁটেল ধরণের। মাটির উপরের স্তর অম্লীয়। বনাঞ্চলের মাটি লবণাক্ত ও এঁটেল। সুন্দরবনের মাটি ক্ষারধর্মী। জেলার পানিতে লবণের মাত্রা ৫->১০ পি.পি.এম.। কিন্তু মাটিতে বেশি লবণাক্ততা দেখা যায় (৮->১৫ পি.পি.এম.)।

নদী-মোহনা : অসংখ্য নদী-নালা বাগেরহাট জেলায় জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। জেলার অর্থনীতিতে এই নদীগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত কয়টি প্রধান নদী হল ভৈরব, পশুর, ভোলা, বলেশ্বর, দরাটানা, আতাই এবং ঘশিয়াখালী। প্রধান এই নদীগুলো আবার অসংখ্য নালা ও খালে বিভক্ত হয়ে সমস্ত জেলা

প্রধান নদী	শিবসা, দরাটানা, পশুর, পানগুছি, হরিণঘাটা, বলেশ্বর, ভোলা ও মংলা নদী
সুন্দরবনের নদী	পশুর, রায়মঙ্গল, হাড়িয়াভাঙ্গা, বলেশ্বর, শিবসা, ভোলানদী, হরিণভাঙ্গা, বাঙ্গুয়া, ধুন্দলী, কোকিলমণি, শ্যামা
নদীর দৈর্ঘ্য	৩৭০ কি.মি.
উৎপত্তি স্থান	উজানের নদী /গঙ্গা

জুড়ে ছড়িয়ে আছে এবং খাঁড়ি, উপধারা দিয়ে বঙ্গোপসাগরের সাথে যুক্ত। যোগাযোগের ক্ষেত্রে নৌপথ প্রধান ভূমিকা পালন করে। এই সব নদীতে সারা বছর ধরে জোয়ার-ভাটা হয় এবং নাব্য থাকে। জেলার মোট নদী পথ ২০৫ কি.মি., যা ৭৬ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে আছে।

১৪২ কি.মি. দীর্ঘ পশুর নদী সুন্দরবনের সবচেয়ে বড় নদী। এর প্রবাহ ও নাব্যতার উপর ভৈরব, রূপসা, কাজীবাচাসহ সব নদী নির্ভরশীল। এই নদীপথে খুলনা-বরিশালগামী লঞ্চ ও স্টীমারসহ অন্যান্য নৌযান চলে এবং এর তীরে মংলা সমুদ্রবন্দর অবস্থিত। জনশ্রুতি মতে, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে নড়াইল জেলার 'ধনদা' গ্রামের লবণ ব্যবসায়ী জনৈক রূপচাঁদ সাহা নৌকায় যাতায়াতের সুবিধার জন্য ভৈরব ও কাজীবাজারের সাথে খাল খননের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করেন। আর তার নামানুসারে এই খালের নাম হয়ে যায় রূপসা। সেই সময়ের খাল রূপসা পরবর্তীতে ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করে বর্তমানের রূপসা নদীতে রূপান্তরিত হয়।

উল্লেখ্য, বলেশ্বর, পশুর, রায়মঙ্গল, হাঁড়িয়াভাঙ্গা, ভোলা, মংলা, বগীখাল, সাচন গাং, শিবসা, হরিণভাঙ্গা, বাঙ্গুয়া, ধুন্দলী, কোকিলমনি, শ্যামা ইত্যাদি নদী সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রধান কয়টি নদী এবং খাল।

বাগেরহাটের সর্ব পূর্বের মোহনার নাম হরিণঘাটা, যা বাগেরহাট থেকে ২৪ কি.মি. পূর্ব-দক্ষিণে বরগুনা ও পিরোজপুর সীমান্তে অবস্থিত। এই মোহনার প্রবেশ মুখ প্রায় ১০ কি.মি. প্রশস্ত ও দুই তীর থেকে ভূ-খণ্ড স্পষ্ট দেখা যায়।

চর-দ্বীপ : বাগেরহাট জেলার আর একটি অন্যতম প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চরাঞ্চল ও দ্বীপাঞ্চল। দুবলা, আলোর কোল, মেহের আলীর চর, ভোলার চর ও পশুর নদীর চর জেলার প্রধান চরের কয়েকটি।

দুবলা চর : জেলার শরনখোলা উপজেলায় সুন্দরবন পূর্ব বিভাগে দুবলার চর অবস্থিত। এই চরটিতে কোন রক্ষাবাঁধ নেই। এই দ্বীপটির আয়তন ৭৪ বর্গ কি.মি.। শুকনা মৌসুমে বসবাসযোগ্য ভূমির পরিমাণ ১.৬৫ বর্গ কি.মি.। এই দ্বীপে কোন স্থায়ী বসতি নেই। মৌসুমে অস্থায়ী ভাবে প্রায় ৮,০০০ পুরুষ লোক মাছ ধরতে আসেন। এই সব জেলেরা বাংলা মাস আশ্বিনের শেষ সপ্তাহে আসে এবং ফাগুন মাস পর্যন্ত চরে থাকে। এরা মাসে ১৫-২০ দিন মাছ ধরে। প্রতি মৌসুমে ৮-১০ জনের একটি দল ২-৩ লাখ টাকার মাছ ধরতে পারে। এসব জেলেদের জন্য কোন পয়ঃসুবিধা, বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। এই সব জেলেরা বেশিরভাগ চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, বাগেরহাট, খুলনা থেকে আসে। এই চরে সমুদ্রের স্রোতের ফলে কিছু ভাঙন রয়েছে। এই দ্বীপে ৪টি সাইক্লোন আশ্রয় কেন্দ্র এবং ১টি বাতিঘর রয়েছে। বনবিভাগের ২টি ও মংলা বন্দরের ১টি অফিস রয়েছে।

আলোর কোল : এই চরটি দুবলার চরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এই চরে শুষ্ক মৌসুমে (কার্তিক থেকে ফাগুন মাস) বিভিন্ন জায়গা থেকে জেলেরা এসে বাসা বাধে এবং ৫ মাস পরে আবার চলে যায়। এই চরে জেলেদের স্বাস্থ্য, খাবার পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই। খাবার পানির একমাত্র উৎস ২৫০ ফুট দৈর্ঘ্যের এবং ২০০ ফুট প্রস্থের একটি পুকুর। এই চরে প্রতি বছর প্রায় ২৫০০-৩০০০ জেলে এসে প্রায় ৩০০-৩৫০টি ঘর তৈরি করে বসবাস করে। তাদের একমাত্র পেশা সমুদ্রে মাছ ধরা এবং এক মৌসুমে ২-৩ লাখ টাকার মাছ ধরতে পারে। এরা বেশিরভাগ আসে রামপাল, বাগেরহাট, কয়রা, পাইকগাছা ও খুলনা এলাকা থেকে। এই চরে একটি মাত্র সাইক্লোন আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে। ১২টি জেটি, ১৫০-১৭০০ মাছ শুকানোর চাটাই রয়েছে। বন বিভাগ ও মংলা বন্দর অফিস রয়েছে।

মেহের আলীর চর : এ চরটি দুবলার চরের পশ্চিমে অবস্থিত। এ চরে ১,৭০০ লোক বসবাস করে এবং এরা দল বেধে থাকে এবং প্রায় ২০টি ঘরে সবাই মিলে থাকে। এরাও শুষ্ক মৌসুমে (আশ্বিন-ফাল্গুন) মাছ ধরে এবং বর্ষা

আসার পূর্বে চলে যায়। এ চরে ১৫-২০টি মাছ নামার ঘাট রয়েছে। এখানেও পয়ঃসুবিধা, বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই । এ চরে কিছু দোকান পাট আছে এবং ১টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র আছে। এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি দ্বীপচর আছে যেখানে কোন স্থায়ী বসতি নেই। যেমন মাঝের কেল্লা, অফিস কেল্লা, ডিমের চর। এসব চরে অস্থায়ীভাবে শুস্ক মৌসুমে জেলেরা এসে থাকে এবং সমুদ্রে মাছ ধরে ও শুঁটকি তৈরি করে। কার্তিকের শেষ সপ্তাহ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত থাকে। এর মধ্যে মাঝের কেল্লা ও অফিস কেল্লায় ১টি করে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র আছে।

ভোলার চর : এ চরটি সুন্দবনের মধ্যে ভোলা নদীর পারে এবং মোরেলগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত। প্রায় ৩০ বছরের পুরানো এ চরের আয়তন প্রায় ৩ বর্গ কি.মি.। এখানে স্থায়ীভাবে প্রায় ৫ শত পরিবার বসবাস করে এবং লোকসংখ্যা প্রায় ২,৫০০ জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১,৫০০ এবং মহিলার সংখ্যা ১,০০০ জন। এ চরে বেশিরভাগ লোকই ক্ষুদ্র কৃষক এবং মৎস্যজীবী। স্বল্প সংখ্যক লোক আছে যারা ক্ষুদ্র ব্যবসা করে। এখানে শিক্ষার হার ৪৫%। কোন স্কুল নেই, এখানে ১টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ২টি হাট, ৩টি পোস্ট অফিস, ১টি ধানভাঙ্গা কল আছে। এ চরে ব্রাক, প্রশিকা, আশা, সিডিসি, সিআরসি রানার প্রভৃতি এনজিও কাজ করে। এ চরে মূল সমস্যা হচ্ছে দারিদ্র, লবণাক্ততা, খাবার পানি ও স্বাস্থ্য সেবার অভাব।

পশুর নদীর চর : এ চরটি বাগেরহাট সদর উপজেলার কড়পারা ইউনিয়নের মঝিডাঙ্গা মৌজায় অবস্থিত। প্রায় ৩৫-৪০ বছর পূর্ব থেকে স্থায়ী এই চরের আয়তন ৩ বর্গ কি.মি.। পরিবারের সংখ্যা ২৮৬টি এবং জন সংখ্যা ১,৩২৭ জন এর মধ্যে পুরুষ ৭২০ জন এবং নারী ৬০৭ জন। শিক্ষা হার ১৪%। জনসাধারণের বেশিরভাগ কৃষি কাজ করে এবং ২০% ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ১৫% শ্রমিক ও ১০% জেলে। চরের মধ্যে ২.৫০ কি.মি. রাস্তা ও একটি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। ১৮৬টি পরিবারের লেট্রিন রয়েছে এবং ২৮৬ টি পরিবার নলকূপের পানি ব্যবহার করে। ব্র্যাক ও প্রশিকা এখানে কাজ করে।

বাগেরহাটের কিছু চর আছে মূল ভূমির সাথে। যেমন বড় আমবাড়ি, ছোট আমবাড়ি, কটকার কোট, কবরখালী, কোকিলমনি, মুজিবনগর চর, নারিকেলবাড়ি, ছেলার চর ইত্যাদি। এর মধ্যে ছেলার চর, পশুর নদীর চর, মুজিবনগর চর ও ভোলার চরে জনবসতি আছে।

পুকুর : জেলার সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে নানা ধরনের পুকুর। যার মোট এলাকা ২৫৩৪ হেক্টর, এর মধ্যে মাছ চাষ করা হয় ২০৯২ হেক্টর পুকুরে, পরিত্যক্ত পুকুরের পরিমাণ ১৯৩ হেক্টর।

মোট পুকুরের পরিমাণ	২৫৩৪ হে.
মাছ চাষের পুকুর	২০৯২ হে.
পরিত্যক্ত পুকুর	১৯৩ হে.

উদ্ভিদ ও জীব বৈচিত্র্য : বাগেরহাট জেলার উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের মধ্যে আছে ম্যানগ্রোভ গাছপালা, লতা-গুল্ম, বাঁশ-বেত-ঝোঁপসহ ৩৩৪ প্রজাতির গাছ, ১৬৫ প্রজাতির শৈবাল এবং ১৩ প্রজাতির অর্কিড।

সুন্দরবনের অন্যতম প্রধান গাছ সুন্দরী (মোট গাছের ৪৭%) বনের ৭৩ শতাংশ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। সুন্দরী কাঠের বার্ষিক উৎপাদন ৩ লাখ ঘনফুট। এ ছাড়াও ১৩ শতাংশে গেওয়া গাছ আর বাকী ১১ শতাংশ জুড়ে পশুর, গরাণ, কেওড়া, বাইন, সাদাবাইন, ধুন্দল, কাঁকড়া, গোলপাতা, সিংরা, হেতাল, খলসী, হারগোজা,

আমুর, ধানসি ইত্যাদি দেখা যায়। বাংলাদেশের মোট কাঠ সম্পদের ৬০% আসে সুন্দরবন থেকে এবং দেশের বনৌষধির চাহিদা পূরণে সুন্দরবনের গুরুত্ব অপরিসীম।

সুন্দরীর কাঠ দীর্ঘস্থায়ী এবং তা খুঁটি, ঘরবাড়ী তৈরিতে অতুলনীয়। আমুর ও ধুন্দল ঘরের খুঁটি, হুঁক্কা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। বাইন গাছের ফুল অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং এ থেকে মৌমাছিরা মধু আহরণ করে। এ ছাড়া গর্জন, গরাণ এবং কাঁকড়া গাছের কাঠ অত্যন্ত উঁচুমানের। গেওয়া গাছ দেয়াশলাই তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। কেওড়া গাছের পাতা ও ফল হরিণের প্রিয় খাদ্য। শিংড়া গাছ সর্বোৎকৃষ্ট জ্বালানি হিসেবে বহুল পরিচিত। এখানে উল্লেখ্য যে, সুন্দরবনের মধ্যে কোন ফলের গাছ জন্মে না। সুন্দরবন ছাড়াও জেলার জলাভূমি অর্থাৎ প্রধানত বিল এলাকায় বহু ধরনের আগাছা জন্মে। গ্রামাঞ্চলে তাল ও বাঁশঝাড় দেখা যায়। ফলজ গাছের মধ্যে অন্যতম হল আম ও কাঁঠাল। ঘরের দরজা জানালা, বাক্স তৈরীতে এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও নারিকেল, সুপারি গাছ প্রচুর।

উদ্ভিদ বৈচিত্র্য	**৩৩৪ প্রজাতির গাছ, ১৬৫ প্রজাতির শৈবাল এবং ১৩ প্রজাতির অর্কিড**
প্রধান গাছ	**সুন্দরী, আমুর, দুন্দল, বাইন, গর্জন, গড়ান এবং কাঁকড়া**
প্রাণী বৈচিত্র্য	**৩৭৫ প্রজাতির বন্যপ্রাণী, ২৭৫ প্রজাতির পাখি**
স্তণ্যপায়ী প্রাণী	**৪২ প্রজাতি**
প্রধান প্রাণী	**রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, বানর, শেয়াল, কাঠবিড়ালী, বন বিড়াল, গেছো বিড়াল, সাপ ও কুমির**

সুন্দরবন জীব বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এখানে প্রায় ৩৭৫ প্রজাতির বন্যপ্রাণী রয়েছে। এর মধ্যে ৪২ প্রজাতির স্তণ্যপায়ী প্রাণী। সুন্দরবন বিশ্ববিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের আবাসভূমি। চিত্রা হরিণ বনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রাণী। এখানে গাছে গাছে বানরদের অবাধ বিচরণসহ শেয়াল, কাঠবিড়ারী, বন বিড়াল, গেছো বিড়াল, উদ, গন্দগোকুল, খাটাশ, বাঘা বিড়াল, বন্য শুকর, মায়া হরিণ, মেঠো ইঁদুর, গেছো ইঁদুর ইত্যাদি দেখা যায়। এছাড়াও আছে প্রায় ৩৫ প্রজাতির সরীসৃপ, যেমন, গোখড়া, কারাইত, রাজসাপ, অজগর, বাটাগুর/থেরাপিন, চোরা ও ঘাস সাপ ইত্যাদি। নদী-মোহনায় কুমির, লবণ জলের কুমির, মেছো কুমির, ঘড়িয়াল, হাঙ্গড়, শুশুক, নীল তিমি, সবুজ কচ্ছপ, হলুদ কচ্ছপ, তিনসির কচ্ছপ, ডলফিনের অবাধ বিচরণ চোখে পড়ে।

সুন্দরবনে ২৭৫ প্রজাতির পাখী রয়েছে। বন্য পাখীর মধ্যে বাজ, ঈগল, চিল, শকুন উল্লেখযোগ্য। জলাভূমিতে কানী বক, গো-বক, চাগা, ডুবুরী, মাছরাঙা, বাবুই, বুলবুলি, টিয়া, টেংগা, মদনটাক, চিটাঘুগু, হরিয়াল, চোখগেলো, কাঠঠোকরা, পানকৌড়ি ইত্যাদি পাখ-পাখালী দেখা যায় । বনাঞ্চলে ফুলে ফুলে প্রজাপতি, মথ, ভ্রমর, মাছির গুঞ্জন শোনা যায়।

সাগরের মাছ : জেলায় সমুদ্র উপকূলে এবং মোহনায় প্রচুর সাগরের মাছ পাওয়া যায়। এই জেলায় বহু সমুদ্রগামী মৎসজীবী রয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় এবং মংলা, শরনখোলা, রায়েন্দা উপজেলার বিভিন্ন ঘাটে সমুদ্রের মাছের পাইকারি বাজার বসে। এই জেলায় সামুদ্রিক মাছ খুবই জনপ্রিয়। জেলায় যে সব সমুদ্রের মাছ পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে রূপচান্দা, বাটা, ফাইসা, গুইছ্যা, ভেটকি, পীতাম্বরী, হাউজীপাতা বা শাপলাপাতা, পাখি মাছ, বাদুড় মাছ, বিদ্যুৎ মাছ, গুর্তা, চন্দনা ও পদ্মা ইলিশ, সাগর মাগুর, উড়াল মাছ, বংশী মাছ, তুলার ডাটি, ফ্যাসার প্রজাতি, কোড়াল মাছ, কাটা মৌছি, সাগর কাউন, লোটিয়া, চান্দা, দাতিনা, সাদা পোয়া, ছুরি মাছ, তাউল্লা বা তাউড়া, সোলি মাছ, রূপালী পটকা, বাদামী পটকা, বিষতারা, ফিতা মাছ, ডোরা রঙ্গিলা, গুটি মুর বাইল্লা, খল্লা, কাউয়া, সাগর চাপিলা ইত্যাদি। এ রকম প্রায় ১৫০ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ এ উপকূলে পাওয়া যায়।

এ ছাড়া রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির অপ্রচলিত সম্পদ যেমন শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া, শৈবাল, সী উইড, জেলী মাছ, কচ্ছপ ও প্রবাল।

মিঠা পানির মাছ : জেলার নদী, খাল-বিল, জলাশয় ও পুকুরে প্রচুর মিঠাপানির মাছ পাওয়া যায়। এ সব মাছ হচ্ছে চাপিলা, কাচকি, ফ্যাসা, চিতল, ফলি, রুই, কাতল, ঘনিয়া, কালিবাউশ, নানদিনা, মৃগেল, রায়েক, কমনকার্প, ঘেসো রুই, সরপুঁটি, থাইসরপুঁটি, চোলাপুঁটি, তিতপুঁটি, ফুটনীপুঁটি, দেতোপুটি, কোসাপুঁটি, কাঞ্চনপুঁটি, মলা, নারকেলি চেলা, ছ্যাপচেলা, বাশঁপাতা, গুজি আইব, তল্লা আইর, গুলশা টেংরা, গুলো টেংরা, বুজুরী টেংরা, কাউনে, রিটা, রোল, পাবদা, গাউড়া, কাজলি, বাচা, সিলেন্দা, পাঙ্গাস, বাঘা আইর, গজার, শোল, টাকি, তেলোটাকি, কুঁচে, টাকা চান্দা, ভেদা, নাপতে কতই, তেলাপিয়া মোজাম্বিকা, তেলাপিয়া, নাইলোটিকা, তুম্ভবেলে, ডোরা বেলে, দুধু বেলে, কালতু বেলে, পোয়া, লাল চেউ, ডরকী চেউ, মাডস্কীপার বা ডঙ্কুর, কই, খলিসা, বইচা, খল্লা, কেচি খল্ল, তপসে, বড় বাইন, গুটি বাইন, তার বাইন, টেপা, পটকা ইত্যাদি। এই জেলায় বেশ কিছু জলাশয় রয়েছে যেখানে প্রচুর ছোট মাছ পাওয়া যায়। যেমন কাচকী, চাপিলা, পুঁটি, ট্যাংরা ইত্যাদি।

বনজ সম্পদ

বাগেরহাট জেলায় মোট বনাঞ্চলের পরিমান ২৩০৯১৯ হেক্টর যার মধ্যে আছে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের একাংশ।

সুন্দরবন : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের কূল ঘেঁষে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট জেলার মোট ৬,০১৭ বর্গ কি.মি. এলাকায় সুন্দরবনের অবস্থিতি। আন্তঃসীমান্ত এই বনভূমির মোট ৪,২৬৪ বর্গ কি.মি. পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের মোট আয়তনের ৪.২% এবং সমগ্র বনভূমির ৪৪% হল সুন্দরবন। সুন্দরবনের মোট আয়তনের ৬৭% স্থলভাগ এবং ৩১% জুড়ে রয়েছে জলভাগ। এখানে রয়েছে তিনটি অভয়ারণ্য। উল্লেখ্য, সুন্দরবনের মোট আয়তনের ২৩% হল বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা। সুন্দরবনের জলবায়ু নিরক্ষীয় সামুদ্রিক ধরনের। তাই এখানে ভারী মৌসুমী বৃষ্টিপাত ও গরম আর্দ্র আবহাওয়া অনুভূত হয়। শীতের তীব্রতা কম, মৃদু এবং শুষ্ক।

বাগেরহাট জেলার সুন্দরবনের পূর্ব বেষ্টনী পিরোজপুর ও বরগুনা জেলার সীমানা পর্যন্ত এবং পশ্চিম বেষ্টনী খুলনা জেলা কিন্তু এই বন পশ্চিমে বাংলাদেশের সাতক্ষিরা জেলা অতিক্রম করে ভারতের সীমানার মধ্যে বিস্তৃত। বনের দক্ষিণ সীমানা বঙ্গোপসাগরে মিলেছে। বাগেরহাট জেলার শরনখোলা, মোরেলগঞ্জ, মংলা উপজেলায় এই সুন্দরবন অবস্থিত। সুন্দরবনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, তদারকি ও উন্নয়নের স্বার্থে ২০০১ সালের জুন মাসে সুন্দরবনকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন পূর্বভাগ (বাগেরহাট অঞ্চল), খুলনা অঞ্চল ও সাতক্ষিরা অঞ্চল। সুন্দরবন পূর্ববিভাগের (বাগেরহাট) আওতায় পড়েছে শরনখোলা রেঞ্জ ও চাঁদপাই রেঞ্জ। চাঁদপাই রেঞ্জ পূর্বের স্থান থেকে সরিয়ে মংলা বন্দর থেকে ৬/৭ কি.মি. দক্ষিণে সরিয়ে জয়মনিতে স্থানান্তারিত করা হয়েছে। তবে

এখনও পূর্ব নাম বহাল আছে। এই দুটি রেঞ্জের অধীনে ৭টি ফরেস্ট অফিস রয়েছে। চাঁদপাই রেঞ্জে ফরেস্ট অফিস ৪টি, এ গুলো হচ্ছে টাইংমারি, চাঁদপাই, জিউধরা ও ধানসাগর। এখানে টহল ফাড়ির সংখ্যা ১১টি, গোলপাতা কূপ আছে ২টি এবং গড়ান কূপ আছে ১টি। শরনখোলা রেঞ্জে ফরেস্ট স্টেশনের সংখ্যা ৩টি। এ গুলো হচ্ছে বগী, সুপতি ও শরনখোলা। এ রেঞ্জে টহলফাড়ির সংখ্যা ১১টি, গোলপাতার কূপের সংখ্যা ১টি এবং গড়ান কূপের সংখ্যা ১টি। সুন্দরবন এলাকায় ৪৫৩ জাতের বিশাল প্রাণীকুল রয়েছে (এস.বি.সি.পি)। অন্যন্য সূত্রে দেখা গেছে ১২০ প্রকারের মাছ, ২৯০ প্রকারের পাখি, ৪২ প্রকারের স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৩৫ সরিসৃপ জাতীয় প্রাণী এবং ৮ প্রকারের উভচর প্রাণী রয়েছে।

সুন্দরবনের ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বন্য প্রাণীর তিনটি অভয়ারণ্যের সমন্বয়ে গঠিত। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংশোধিত আইন ১৯৭৩ অনুসারে সুন্দরবনের ১৩৯,৭০০ হেক্টর এলাকা বন্য জীবজন্তুর নিরাপত্তার জন্য তিনটি অভয়ারণ্য হিসেবে সরকার কর্তৃক ঘোষিত হয়। কটকা কচিখালি ও সুপতি অভয়ারণ্যের সমন্বয়ে ৩১,২২৭ হেক্টরের পূর্ব অভয়ারণ্য, নীলকমল ও দোবাকী অভয়ারণ্য এবং বোটাবেকি, পুষ্পকাটি ও মান্দারবাড়িয়া সমন্বয়ে ৭১,৫০২ হেক্টরের সুন্দরবন তথা পশ্চিম অভয়ারণ্য হিসেবে চিহ্নিত। এ তিনটি অভয়ারণ্য সমন্বয়েই বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে ১৯৯৭ সালে।

সুন্দরবন : বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন

প্রশাসনিক সদর দপ্তর	খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা
সংরক্ষিত এলাকা	সংরক্ষিত বনাঞ্চল, দক্ষিণ সুন্দরবনের বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য, সুন্দরবনের রামাসার সাইট এবং 'বিশ্ব ঐতিহ্য' স্থান
ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য	গাঙ্গেয় জোয়ার-ভাটার নদী প্লাবন ভূমি , ধূসর পলি মাটি ও অম্লীয়
বার্ষিক বৃষ্টিপাত	২,০০১-২,৯১৫ মিমি
তাপমাত্রা	সর্বোচ্চ ৩১.১° সেঃ এবং সর্বনিম্ন ২২.৬° সেঃ (২০০১)
আর্দ্রতা	৮১%
ইকোসিস্টেম	প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন
জীব বৈচিত্র্য	রয়েল বেঙ্গল টাইগার, ডলফিন, চিত্রা হরিণ, কুমীর, কচ্ছপ
উদ্ভিদ বৈচিত্র্য	সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, সাদা বাইন, গোলপাতা, হেতাল ইত্যাদি।
প্রধান সমস্যা	সুন্দরী গাছের আগামরা রোগ, জীব প্রজাতি হ্রাস, বন উজাড়।

এ সব সত্ত্বেও সুন্দরবন আজ নানা কারণে হুমকির মুখোমুখি। এর পেছনে রয়েছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণ। যেমন, সুন্দরবনের উজানের নদীগুলোর প্রবাহ কমে যাওয়ার ফলে পানির লবণাক্ততা বেড়ে গেছে। এই পানি প্রবাহ কমে যাবার ফলে বৃক্ষ, মাছ, বন্যপ্রাণীসহ সর্বোপরি পরিবেশ ধ্বংস হচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে সুন্দরী কাঠের আগামরা রোগ। প্রাকৃতিক কারণের পাশাপাশি মানুষের অবিবেচনাপ্রসূত বিভিন্ন কর্মকান্ডও সুন্দরবনের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। বিভিন্ন তথ্য ও সংবাদ-এর ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে, গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় ১০% ডুবে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে যেটা সুন্দরবনের জন্য খুবই ভয়াবহ। এ ছাড়া প্রাণী নিধন, কাঠ চুরি, অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট বাঁধ ও স্লুইসগেট নির্মাণ এবং বন্দরের জাহাজ থেকে বর্জ্য ফেলার কারণেও সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সম্প্রতি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় দেখা গেছে বাগেরহাটের চাঁদপাই রেঞ্জের ২০০ বর্গমিটার এলাকা ইতিমধ্যে দখল হয়ে গেছে।

খনিজ সম্পদ

বাগেরহাট জেলার একমাত্র খনিজ সম্পদ পিট কয়লা। এই কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে বাগেরহাট জেলায় রামপাল উপজেলার গৌরাঙ্গ মৌজায়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (১৯৯৯) হিসাব অনুসারে, ৩৮.৮৫ বর্গ কি.মি. এলাকায় এই কয়লার মজুদের পরিমাণ ৮ মিলিয়ন টন। উপকূলীয় এলাকায় তেল গ্যাস ক্ষেত্রের উপস্থিতি ও সম্ভাবনার বিচারে পেট্রোবাংলা সমগ্র বাংলাদেশকে মোট ২৩টি ব্লকে ভাগ করেছে ও এই মানচিত্রে সুন্দরবন ৫ ও ৭ ব্লকের অন্তর্ভুক্ত।

পিট কয়লা

উপজেলা	রামপাল
মৌজা	গৌরাঙ্গ
সংরক্ষিত পীট	৮ মি টন
সম্ভাব্য খনিজ	সুন্দরবন এলাকায় তৈল, গ্যাস ক্ষেত্র

কৃষি সম্পদ

কৃষি জমি : বাগেরহাটের উত্তর অংশ এগ্রোইকোলজিক্যাল অঞ্চল **১১** ও **১২** এর অন্তর্ভুক্ত। আর বাগেরহাট জেলা সামগ্রিকভাবে এগ্রোইকোলজিক্যাল অঞ্চল **১৩** তে পড়েছে। জেলার মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ **১২৯৪৩৬** হেক্টর। এর মধ্যে ৯% জমিতে সেচ দেয়া হয়।

কৃষি জমি	১৩১,০৮৯ হে.
বনাঞ্চল	২৩০,৯১৭ হে.
পুকুর	২,৫৩৪ হে.
শস্য নিবিড়তা	১২০

প্রধান ফসল	ধান, পাট, সুপারি, পান ও সবজি
প্রধান রপ্তানী ফসল	ধান, চিংড়ি, পাট, পান, সুপারি, নারিকেল

প্রধান ফসল : বাগেরহাটের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর। এ ছাড়াও অনেকাংশেই সুন্দরবন ও মংলা বন্দরের উপর নির্ভরশীল। জেলার মধ্যবর্তী এলাকা নানা ধরনের ফসল চাষের উপযোগী। ধান, পাট, পান, সুপারি ও সবজি জেলার প্রধান ফসল। জেলার অধিকাংশ কৃষক স্থানীয় ও উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান, গম, সবজি, মশলা ও ডাল চাষ করে থাকে। এ ছাড়া কলা, নারিকেল, সুপারি, পেয়ারা ইত্যাদি ব্যাপক উৎপাদন দেখা যায়। ধান, চিংড়ি, পাট, সুপারি, পান, গুড়, আম, কাঁঠাল জেলার প্রধান রপ্তানি ফসল। এখানে শস্য নিবিড়তা (Cropping intensity) ১২০। এলাকার জমি ব্যবহারের পরিকল্পনা না থাকায় বহু জমিই অব্যবহৃত, অতি ব্যবহৃত বা ভুল ব্যবহার হচ্ছে। ফলে কৃষকের অর্থ ও শ্রম - এই দুয়েরই অপচয় হচ্ছে।

মৎস্য সম্পদ

বাগেরহাট জেলায় সমুদ্র, সুন্দরবন, নদী, খাল ও বিল মিলে রয়েছে এক বিশাল মৎস্য ভাণ্ডার । সেই সাথে বৃহৎ এলাকায় রয়েছে চিংড়ি চাষ।

নদীর মাছ	পাংগাস, ইলিশ, বাগার, চিতল, বোয়াল
বিল - খালের মাছ	কালবাউশ, রুই, কাতল, মৃগেল, বোয়াল, শোল, কই, মাগুর
ধান ক্ষেতের মাছ	ভেটকি, ভাঙন, ট্যাংড়া, পাশা
সামুদ্রিক মাছ	চিংড়ি ও চান্দা

নদী-মোহনা ও বিলের মাছ : জেলার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মাছের প্রাচুর্য্য। নদী, মোহনা, বিল, খাল, খাঁড়ি থেকে ধান চাষের সময় এবং বর্ষাকালে প্রচুর মাছ ধরা হয়। ২০০১-২০০২ সালে জেলায় মোট ১০,২১৩ মেট্রিক টন মাছ ধরা হয়। তার মধ্যে নদী ও মোহনা থেকে ৩৭১৯ মে.টন এবং প্লাবনভূমি থেকে ৬,৪৯৪ মে.টন মাছ ধরা হয়। জেলার নদী-মোহনা, বিল, খাঁড়ি ও নালা বহু ধরনের মাছে পরিপূর্ণ। পাংগাস, ইলিশ, বাগার, চিতল, বোয়াল নদীর মাছ ও কালিবাউশ, রুই, কাতলা, মৃগেল, বোয়াল, শোল, কই ও মাগুর ইত্যাদি বিল - খালের মাছ। সামুদ্রিক মাছের মধ্যে চিংড়ি ও চান্দা অন্যতম । এ ছাড়াও ধান ক্ষেতে দ্রুত বর্ধনশীল ভেটকি, ভাঙন, ট্যাংড়া, পাশা মাছ জন্মে। সাধারণত অক্টোবর-ডিসেম্বর মাসে ধানক্ষেত শুকাতে শুরু করলে এইসব মাছ ধরা হয়। এ ছাড়া সুন্দরবনের নদী মোহনা ও খাঁড়ির মাছের মধ্যে ভেটকি, ইলিশ, ভাঙন, জাবা, কাইবল, রেখা, চিংড়ি প্রধান।

চিংড়ি : বাগেরহাট দেশের অন্যতম চিংড়ি উৎপাদনকারী জেলা। ষাটের দশকের শেষে বাগেরহাটের কিছু অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার কারণে ফসল উৎপাদন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এখানে মাছের স্থানীয় চাহিদা মেটাতে বিকল্প মাছ চাষ পদ্ধতিতে ঘের তৈরি করে মাছ চাষ শুরু করা হয়। সে সময় কেবলমাত্র ভেটকী, পারশে ও টেংরা মাছই চাষ করা হতো। পরে এ সব ঘেরে চিংড়ি চাষ শুরু হয়। সত্তরের দশকে আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে চিংড়ি

একটি লাভজনক ফসল হিসেবে চিহ্নিত হয়। এরপরে আশির দশকে আর্ন্তজাতিক বাজারে চিংড়ি চাহিদা ব্যাপকভাবে বেড়ে যাওয়ায় চিংড়ি চাষ অর্থনৈতিক গুরুত্ব লাভ করে। ফলে, দেশের উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষত দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল চিংড়ি চাষ ব্যাপ্তি লাভ করে। বর্তমানে, বাগেরহাটে চিংড়ি চাষ ও ধানক্ষেতে মাছ চাষ দুটোই ব্যপকভাবে প্রচলিত। উল্লেখ্য, চিংড়ি ঘেরের আইলে সবজি চাষের প্রচলন শুরু হয়েছে। চিংড়ি চাষের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে খুলনায় একটি আঞ্চলিক স্টেশন স্থাপিত হয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের হিসাব (২০০৩) অনুযায়ী গত ২০০০-২০০১ সালে জেলায় মোট ৪৭৭১০ হে. চিংড়ি (গলদা ও বাগদা) ঘের থেকে মোট ২৩৭৬০ মে.টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়। উল্লেখ্য, ১৯৯৬-৯৭ সালে চিংড়ি চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৪৫৮৩৫ হে: এবং তা থেকে প্রায় ১৬৯০৩ মে. টন চিংড়ি উৎপাদিত হয়। এই হিসাবে দেখায় যে, জেলায় চিংড়ি চাষের জমি উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেলেও, চাষীদের অজ্ঞতা, প্রশিক্ষণের অভাব, বিনিয়োগের অভাব, অপর্যাপ্ত চিংড়ি পোনা পরিচর্যা ইত্যাদি কারণে চিংড়ি উৎপাদন কিছুটা বিঘ্নিত হচ্ছে।

সাল	চিংড়ি ঘের (গলদা ও বাগদা)	উৎপাদন
১৯৯৬-৯৭	৪৫৮৩৫ হে.	১৬৯০৩ মে.টন
২০০০-০১	৪৭৭১০ হে.	২৩৭৬০ মে.টন

শুঁটকি : এই জেলার মূল ভূ-খণ্ডে, চর ও দ্বীপ অঞ্চলে (বিশেষ করে রায়েন্দা, দুবল, আলোর কোল, মেহের আলীর চর, মংলা নদীর চর) প্রচুর পরিমাণ শুঁটকি তৈরি করা হয়। বাগেরহাট জেলার শরনখোলা উপজেলার দুবলার চরের শুঁটকি খুবই বিখ্যাত। এখানে প্রতিবছর ৭-৮ হাজার জেলে শুস্ক মৌসুমে এসে অস্থায়ীভাবে বসবাস করে এবং সমুদ্রে মাছ মারে ও সামুদ্রিক মাছের (বিশেষ করে চিংড়ি, চান্দা, রূপচান্দা, ছুড়ি, লাক্ষা, লইট্যা মাছের) শুঁটকি তৈরী করে। শুঁটকি দেশের অন্যান্য জেলায় পাঠানো হয়। তবে বেশিরভাগই বিদেশে রপ্তানি করা হয়। দুবলার চরে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, পটুয়াখালী, বরগুনা, খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে জেলেরা আসে। এ ছাড়াও জেলায় প্রচুর পরিমাণ বাগদা চিংড়ির শুঁটকি তৈরি হয়, যা রপ্তানি করা হয়। এই জেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও এনজিও'র সচেতনামূলক কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক জেলে পবিবার আধুনিক পদ্ধতিতে শুঁটকি তৈরি শুরু করেছে।

মাছ চাষ : এই জেলায় ২৫৩৪ হেক্টর পুকুর আছে। এর মধ্যে ২০৯২ হেক্টর পুকুরে মাছ চাষ হয়। চাষাবাদযোগ্য পুকুর আছে ২৪৯ হেক্টর এবং পতিত আছে ১৯৩ হেক্টর। এর মধ্যে ২০৯২ হেক্টর পুকুর থেকে উৎপাদনে হয় ৫১৬৪ মে. টন মাছ। চাষাবাদযোগ্য পুকুর ২৪৯ হেক্টর থেকে উৎপন্ন হয় ৩১১ মে. টন মাছ এবং পতিত পুকুর থেকে উৎপন্ন হয় ৬৩ মে. টন মাছ। মোট উৎপন্ন হয় ৫৫৩৮ মে. টন মাছ (মৎস্য বিভাগ ২০০৩)। পুকুরে যে ধরনের মাছ চাষ হয় সেগুলো হচ্ছে রুই, কাতল, মৃগেল, গ্রাসকার্প, কালিবাউশ, সিলভারকার্প ও তেলাপিয়া ইত্যাদি।

পশু সম্পদ

কৃষি শুমারী ১৯৯৬ অনুসারে বাগেরহাট জেলার গ্রামীণ এলাকায় মোট ৮৮,৬৩১টি গৃহের গ্রামীণ গৃহস্থালির ৩৫% গবাদিপশু রয়েছে, এবং মোট গবাদিপশুর সংখ্যা ২,৬৫,২৪৪। অর্থাৎ, প্রতিটি ঘরে গড়ে ৩টি করে গবাদিপশু আছে। এ ছাড়া, গ্রামীণ গৃহস্থের ৭২% মুরগি লালন পালন করে (ঘর প্রতি ৫.৪৫ মুরগি) । গ্রামীণ গৃহস্থের ৮৬১৭৫

পরিবারে হাঁস লালনপালন করে (৪৫.৪৫%) এবং ঘর প্রতি গড়ে ২.০৪টি করে হাঁস আছে। এ ছাড়া জেলায় মোট ৯২টি পশু সম্পদ খামার এবং ২৬৭টি হাঁস-মুরগি খামার রয়েছে।

দুর্যোগ

বাগেরহাট জেলা প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ এলাকা হিসেবে পরিচিত। জলাবদ্ধতা, পানি-মাটির লবণাক্ততা, সাইক্লোন-জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড় ও পলি অবক্ষেপণ জেলার প্রধান কয়টি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ ছাড়াও মানুষের কাজকর্ম, অসচেতনতা, দারিদ্র্য ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট পরিবেশগত সমস্যা বা দুর্যোগ তো রয়েছেই।

জলাবদ্ধতা : জেলার শহর ও গ্রামাঞ্চলের একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হল জলাবদ্ধতা। নদী-নালা ও খাল-বিল পলিতে ভরাট হয়ে যাওয়া, নদীর ভাটিতে সঞ্চিত পানির পরিমাণ কমে যাওয়া, অপরিকল্পিত বসতি স্থাপন, কৃষি জমির অভাব, সড়ক-মহাসড়ক, পোল্ডার নির্মাণ, অপরিকল্পিত পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও অবকাঠামো এবং দূর্বল নিষ্কাষণ ব্যবস্থা শহরাঞ্চলে ও গ্রামাঞ্চলে জলাবদ্ধতার সংকট বাড়িয়ে চলছে। এ ছাড়া গ্রামাঞ্চলে অপরিকল্পিত মাছের ঘের, নদী-খালে আড়াআড়ি বাঁধ নির্মাণ, কচুরীপানা, পুকুর-খাল মজে যাওয়া, নদী-শাখা নদীতে স্থানীয় প্রভাবশালীদের অলিখিতভাবে ইজারা নিয়ে দখল এবং শহরের কাঁচা পাকা ড্রেনগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের কারণে সামান্য বৃষ্টিতেই বাগেরহাট জেলা শহর ও উপজেলাগুলোতে জলাবদ্ধতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মাটি ও পানির লবণাক্ততা : মাটি ও পানির লবণাক্ততা বাগেরহাট জেলার একটি অন্যতম দুর্যোগ। উজানে পদ্মা, গরাই, মধুমতি নদীতে শুকনো মৌসুমে পানির প্রবাহ কমে যাবার ফলে বাগেরহাটের ভূ-উপরিস্থিত পানি ও মাটিতে লবণাক্ততা বেড়ে যায়, যা স্বাভাবিক কৃষি ব্যবস্থা ও শিল্পে বিশুদ্ধ পানির ব্যবহারকে অনিশ্চিত করে। এতে একদিকে যেমন ফসলের ক্ষতি হচ্ছে, অন্যদিকে জমির সার্বিক উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে। একদিকে যেমন চিংড়ি ঘেরের জমি লবণাক্ত হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে নালার সাহায্যে চিংড়ি ঘেরে লোনা পানির প্রবেশ ঘটানোর ফলে আশপাশের ধান ক্ষেতের জমিও লবণাক্ততায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। এ ছাড়া সুন্দরবন এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানিও লোনায় আক্রান্ত হওয়ায় নিরাপদ পানির অভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শরনখোলা, মোরেলগঞ্জ, রামপাল, সদর, মোল্লারহাট, মংলা কচুয়া, চিতলমারির হাজার হাজার মানুষ এই সংকটে ভুগছেন। বিশুদ্ধ পানির অভাব এই জেলার একটি অন্যতম সমস্যা। গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তন, ভৈরব, মধুমতি নদীর মুখ ভরাট হওয়া, উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্প, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ইত্যাদি আঞ্চলিক কারণ ও অপরিকল্পিতভাবে বাগদা চাষ, ভূ-গর্ভস্থ জলাধারের অভাব, আর্সেনিক দূষণ প্রভৃতি কারণে জেলার নিরাপদ পানির সংকট ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করেছে। আর তাই, এসব এলাকায় পুকুর অথবা বৃষ্টির পানিই প্রধান ভরসা। শুকনো মৌসুমে পানির অভাবে এখানকার মানুষ লবণাক্ত পানি পান করে। আর তাই চর্মরোগ, পেটের পীড়া, আমাশয়, ডায়রিয়া, প্রজনন ও স্বাস্থ্যগত সমস্যাসহ শারিরীক দুর্বলতার শিকার এই এলাকার মানুষ।

উপজেলা	লবণাক্ততা (ds/m)				জলোচ্ছ্বাস (প্রতি বছর)	সাইক্লোনের ঝুকি
	মাটি	ভূ-উপরিস্থত	ভূ-গর্ভ	সার্বিক সম্ভাব্য লবণাক্ততা (উপস্থিত/ অনুপস্থিত)		
বাগেরহাট সদর	৪-৮	>১০	২-৫	***	>২	-
শরনখোলা	>১৫	১-৫	>১০	**	>২	H
মংলা	>১৫	>১০	>১০	***	>২	H
মোরেলগঞ্জ	৪-৮	>১০	৫-৫	***	>২	L
কচুয়া,	৪-৮	৫-১০	২-৫	***	>২	-
রামপাল	৪-৮	>১০	২-৫	***	>২	-
চিতলমারি	>১৫	>১০	২-৫	***	>২	-
মোল্লাহাট	৪-৮	৫-১০	২-৫	***	>২	H
ফকিরহাট	>১৫	৫-১০	২-৫	***	>২	-

সাইক্লোন : বাগেরহাট জেলা বঙ্গোপসাগরের কাছে অবস্থিত হওয়ায় এখানে দুই ধরনের ঝড়ের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। সামুদ্রিক ঝড়ো বাতাসের অতিরিক্ত আর্দ্রতার ফলে সৃষ্ট ঝড় এবং গভীর সাগরের নিম্নচাপের ফলে সৃষ্ট

সাইক্লোন। তবে বর্তমানে এই জেলায় টর্নেডোর প্রকোপও দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মোট **১৫**টি বড় ধরনের সাইক্লোন বাগেরহাটে আঘাত হানে। প্রতিটি ঘূর্ণিঝড়ের ফলে জেলার সম্পদ বিশেষ করে ফসল, জনপদ, গাছপালা, গবাদিপশুর ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ ছাড়া প্রাণহানীর ঘটনাতো রয়েছেই। উল্লেখ্য, **১৯০৯** সালে বাগেরহাটসহ বৃহত্তর খুলনা জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড়ের কবলে মোট ৬৯৪ জনের প্রাণহানী ঘটে (গেজেটিয়ার, **১৯৭৮**)।

নদী ভরাট : অপরিকল্পিত ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও নদী শাসন ব্যবস্থা এবং জটিল পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কারণে জেলার নদ নদীগুলোতে পলির অবক্ষেপণ বাড়ছে এবং অকালে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে জেলার পানি নিষ্কাষণ ব্যবস্থা দিন দিন ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে, সৃষ্টি হচ্ছে দীর্ঘস্থায়ী লবণাক্ততা। নদীগুলো তাদের নাব্যতা হারিয়ে অনুকূল প্রাকৃতিক প্রতিবেশ ও ভারসাম্য নষ্ট করছে এবং শহর, গ্রাম, জনপদের মানুষকে বিপদাপন্ন করে তুলছে। ভোলা, মংলা, দরাটানা ও মধুমতি নদী অস্তিত্ব হারাবার আশংকা দেখা দিয়েছে।

নদী ভাঙন : জেলার আর একটি উল্লেখযোগ্য দুর্যোগ নদী ভাঙন। বলেশ্বর, পশুর ও পানগুছি ভাঙনে শরনখোলা, মোরেলগঞ্জ, রামপাল, মংলার অনেক গ্রাম বিলীন হয়ে গেছে। বিশেষ করে শরনখোলা উপজেলার রায়েন্দা বাজারের পুর্ব এলাকা বলেশ্বর নদীর ভাঙনে বিলীন হবার পথে। এ ভাঙনের ফলে প্রায় ৫ শত পরিবার আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে। এরা বেশিরভাগ বেড়ীবাঁধ ও অন্যের জমিতে ঘরবাড়ি তুলে মানবেতর জীবনযাপন করছে। রায়েন্দা বাজারের একমাত্র শশ্মান ঘাটটি নদীগর্ভে চলে গেছে। এ ছাড়া প্রমত্তা পানগুছি নদীর ভাঙনে মোরেলগঞ্জের আবাদি জমিসহ বিস্তীর্ণ এলাকা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। **১৬**টি ইউনিয়ন সমৃদ্ধ মোরেলগঞ্জ উপজেলার মানচিত্র পানগুছি নদীর ভাঙনে পাল্টে যাচ্ছে। বারইখালী, বড়ইবুনিয়া, হোগলাবুনিয়া, মোরেলগঞ্জ, বহরবুনিয়া, পুটিয়াখালী ইউনিয়নের নদী সংলগ্ন গ্রামের হাজার হাজার বিঘা আবাদী জমি ও শত শত ঘরবাড়ী পানগুছি নদী গ্রাস করে নিয়েছে। মোরেলগঞ্জের স্থাপতি রবার্ট মোরেলের স্মৃতিস্তম্ভ, কুঠিবাড়ি বাড়ইখালী পুরান থানা ভবন, (কৃষক আন্দোলনের স্মৃতিবহুল গ্রাম) এই পানগুছি নদী গ্রাস করতে চলেছে। পাল্টে যাচ্ছে এসব এলাকার সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা।

ভরা জোয়ার : সুন্দরবন এলাকা সব সময়ই ভরা জোয়ারের পানিতে ডুবে যায়। বর্ষায় নদীর পানির প্রবাহ বেড়ে সাগরের পানির উচ্চতা বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে ভরা জোয়ারের লোনা পানিতে সুন্দরবনের উপকূলসহ জনপদ প্লাবিত হয়। শুধু তাই নয়, নদী তীরবর্তী এলাকাগুলোতে ভরা জোয়ারের প্রভাব অপরিসীম।

বন্যা : প্রবল বর্ষণ আর নিষ্কাষণ জটিলতার কারণে বাগেরহাটে বন্যার প্রকোপ দেখা যায়। জেলার পূর্ব-উত্তরের নিম্নাঞ্চল জলমগ্ন হয়ে থাকার ফলে বন্যার প্রকোপ বেশি। জেলার নদ-নদীর পানি অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে গেলে তা দুকূল ছাপিয়ে বন্যার রূপ নেয়। উল্লেখ্য, প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট বন্যার মধ্যে অন্যতম হল **১৯৭৮**, **১৯৮১** ও **১৯৮৭-৮৮** সালের বন্য। **১৯৮৭**, **১৯৮৮** সালে পর পর দুবার বন্যায় চিতলমারি, মোল্লাহাট, কচুয়া, ফকিরহাট উপজেলা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি : সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি সুন্দরবনের জন্য বিরাট হুমকি। মূলত সমগ্র বাংলাদেশই গাঙ্গেয় দ্বীপ হবার কারণে আজ এই হুমকির সম্মুখীন। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে এলাকা প্লাবিত হচ্ছে এবং সুন্দরবনকে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

জলবায়ুর পরিবর্তন : বিশ্বময় জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। এর প্রভাব বাংলাদেশেও পড়ছে, বিশেষ করে শুস্ক মৌসুমে বৃষ্টিপাত কমে গিয়ে সমস্যা সৃষ্টি করছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ায় পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে। ফলে দেশের উপকূল এলাকাসহ সুন্দরবন ও নতুন করে সৃষ্টি করা ম্যানগ্রোভ বন হুমকির মুখোমুখি।

পরিবেশ দূষণ : মানুষের অসচেতনতা, অজ্ঞতা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং শহরের অবকাঠামো জেলার সামগ্রিক পরিবেশ দূষণে প্রভাব ফেলছে। বাগেরহাট জেলায় পরিবেশ দূষণ একটি অন্যতম সমস্যা। অধিক জনসংখ্যা, দারিদ্র, অপরিকল্পিত এবং অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ (মংলা, পশুর নদীর পূর্বতীরে এবং খুলনা-মংলা সড়কের পাশে), শিল্প কারখানা, পৌরসভার আবর্জনা ও হাট বাজারের আবর্জনা, ইটের ভাটা, অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট জেলার পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ।

এ ছাড়াও চিংড়ি ঘেরে খাদ্য হিসেবে শামুকের ব্যাপক ব্যবহারের কারণে এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। শামুকের মাংস যেমন চিংড়ির খাদ্য অন্যদিকে শামুকের আবরন ব্যবহার হয় হাঁস মুরগীর খাদ্য প্রস্তুতিতে। ফলশ্রুতিতে এলাকার জীব বৈচিত্র্য এবং ইকোসিষ্টেম হুমকির মুখে।

শিল্প দূষণ : পরিবেশগত বিপর্যয়ের আশংকাকে বাড়িয়ে চলেছে শিল্প দূষণ। খুলনা নগরীর শিল্প কারখানা স্থাপন, ফ্যাক্টরি বা মিল থেকে বর্জ্য পদার্থ রূপসা ও পশুর নদীতে নিঃসরণের ফলে সৃষ্ট শিল্প দূষণ বাগেরহাট জেলাকে দূষিত করছে। খুলনা নৌবন্দর ও মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার তরল বর্জ্য নদী-নালার পানিকে দূষিত করছে। বিশেষ করে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল, হার্ডবোর্ড মিল, গোয়ালপাড়া থারমাল শক্তি স্টেশন আর খালিশপুরের পাট ও লৌহ কারখানার বর্জ্যে ভৈরব, রূপসা ও পশুর নদীর পানি দূষিত করছে। বাগেরহাট জেলার মাছের ঘেরে সার, রাসায়নিক পদার্থ ও অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার ঘের এলাকার পার্শ্ববর্তী খাল-নালার পানিকে দূষিত করছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বাগেরহাট জেলার ভূ-গর্ভস্থ পানিতে দ্রবনীয় বর্জ্যের মাত্রার পরিমাণ সারা দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি।

জাহাজের বর্জ্য ও তেল নিঃসরণ : জাহাজের বর্জ্য ও তেল নিঃসরণ উপকূলীয় অঞ্চলের মাটি ও পানিকে দূষিত করছে। সমুদ্র উপকূলের বন্দর, নদী বন্দর এবং জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের প্রভাবে সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চল আজ এই দূষণের শিকার। ১৯৯২ সালে বাগেরহাট উপকূলে জাহাজ দুর্ঘটনায় সুন্দরবনের প্রায় ১৫ কি. মি. এলাকায় তেল নিঃসরণ হয়। এটি তাৎক্ষণিকভাবে সুন্দরবনের ঘাস, ম্যানগ্রোভ চারাগাছ, মাছ, চিংড়ি ও জলজ প্রাণীর উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

আর্সেনিক দূষণ : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বাংলাদেশে প্রতি লিটার পানিতে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য সর্বোচ্চ মাত্রা ০.০৫ মি. গ্রা.। বাগেরহাট জেলার পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ এ মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (২০০১) তথ্য অনুসারে জেলায় গভীর নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের গড় মাত্রা ১৫৬ মাইক্রো গ্রাম/লি. এবং জেলার প্রায় ৬০% নলকূপে আর্সেনিকের মাত্রা ৫০ মাইক্রো গ্রাম/লি. এর বেশি।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : বাগেরহাট জেলার জনসাধারণের জীবনের একটি সমস্যা হচ্ছে দৈনন্দিন বর্জ্য বা ময়লা অপসারণ। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, দৈনিক প্রতিটি গৃহ থেকে প্রায় ২ কেজি পরিমাণ বর্জ্য ঘরের বাইরে নির্ধারিত

বা অনির্ধারিত স্থানে ফেলা হয়। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে বাগেরহাট ও মংলা উপজেলায় দৈনন্দিন বর্জ্য বা ময়লা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্যারাবন (ম্যানগ্রোভ) উজাড় : গণমানুষের অজ্ঞতা, চোরাচালান, বনদস্যুদের দৌরাত্ম্য, অতিমাত্রায় জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ, বাগদা ঘের তৈরি ইত্যাদি কারণে বিশ্বের অন্যতম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সুন্দরবন, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিগত ১৫০ বছরে সুন্দরবনের আয়তন ও জীব বৈচিত্র্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আজকের সুন্দরবনের আয়তন ছিল দ্বিগুন। বন উজারের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ায় সামগ্রিক জীব বৈচিত্র্যের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। এর নেপথ্যের কারণ হল অবৈধভাবে গাছ নিধন, কাঠ চুরি, ইটের ভাটায় কাঠ পোড়ানো, বন কেটে কৃষি জমি ও মাছের ঘের তৈরী ইত্যাদি।

জীব প্রজাতি হ্রাস : মানুষের কর্মকাণ্ড, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও আবাস ভূমির অভাবে বহু প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এর মধ্যে এক প্রজাতির বুনো মহিষ, দুই প্রজাতির হরিণ, দুই প্রজাতির গন্ডার, এক প্রজাতির কুমির অন্যতম। এ ছাড়া পানা হরিণ, নীলগাই, নেকড়ে গৌরবান্টিং, বুনো গরু, লালশির হাঁস, ময়ুর এবং মেছো কুমির খুবই দুর্লভ হয়ে গেছে। বন্যপ্রাণী নিধন ও পাচারের ফলে সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার ও চিত্রা হরিণের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। আজ থেকে মাত্র ৫০ বছর আগেও সুন্দরবন কুমিরের স্বর্গরাজ্য হিসেবে বিবেচিত হতো। ভৈরব, মধুমতি নদী ও মোহনায় ব্যাপক কুমির ছিল। কিন্তু বর্তমানে কুমিরের সংখ্যা খুবই কম।

সুন্দরী গাছের আগামরা রোগ : প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপর্যয়ের একটি অন্যতম উদাহরণ হল সুন্দরী গাছের আগামরা রোগ। সুন্দরবনের মোট ৪৩টি কম্পার্টমেন্টে এই রোগ অপ্রতিরোধ্যভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। উপযুক্ত পদক্ষেপ ও প্রতিষেধকের অভাবে স্থানীয় বিশেষজ্ঞরা রোগাক্রান্ত গাছ কেটে ফেলার পরামর্শ দিয়েছেন। এই রোগের কারণ নির্ণয়ে ১৯৯৬-৯৭ সালে বনজসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় বনবিভাগ ব্যাপক গবেষণা চালায়। এরপরে ২০০১-২০০২ সালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় একটি গবেষণা পরিচালনা করে। যদিও এই রোগের সঠিক কারণ এখনো বের করা যায়নি তবে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী সুন্দরবনের মাটির অত্যধিক লবণাক্ততা, মিঠা পানির অভাব, জিংক ও ম্যাঙ্গানিজের স্বল্পতা এবং ক্যালসিয়ামের অতিরিক্ত উপস্থিতি, লরেনথাস/ বা এক ধরনের পরজীবীর আক্রমন এই রোগের কারণ হতে পারে। উল্লেখ্য, সুন্দরবনে আগামরা রোগের এই আশংকাজনক বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে আগামী চার-পাঁচ দশকে এর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যেতে পারে।

মাছের প্রজাতি হ্রাস : সুন্দরবনের জলাভূমি ও মোহনায় মাছের প্রাচুর্য আজ অনেক কমে গেছে। অতিরিক্ত পরিমাণে চিংড়ি পোনা আহরণ মাছের প্রজাতির হ্রাসের একটি প্রধান কারণ। এ ছাড়া অপরিকল্পিত নদী শাসনের ফলে নদী-নালা ও খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় সাদা মাছের বহু প্রজাতিই আজ বিলুপ্ত হবার পথে। উদাহরণস্বরূপ পাতারি মাছের কথা বলা যায়। আগে জেলার নিম্নাঞ্চলে ও জলাভূমিতে এই মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এখন কচুরীপানা, মাছের ঘের, ফসলের মাঠ আর নগরায়নের বিস্তৃতিতে সে সব আজ অতীতের স্মৃতি। ২০০২ সালের মৎস্য আইনে চিংড়ি পোনা ধরা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও এর বাস্তব প্রয়োগ নেই।

বাঘের আক্রমণ : সুন্দরবন বন বিভাগের এক জরীপ অনুযায়ী প্রতি বছর গড়ে ২৫ জন মানুষ বাঘের আক্রমণে প্রাণ হারায়। শরনখোলা ও চাঁদপাই রেঞ্জ এলাকায় বাঘের বিচরণ তুলনামূলকভাবে বেশি।

সুন্দরবনে মধু উৎপাদন হ্রাস : সুন্দরবনের চাঁদপাই ও শরনখোলা রেঞ্জের খোলসে ও গেওয়া গাছ থেকে সর্বোৎকৃষ্ট মধু পাওয়া যায়, যা 'পদ্মমধু' নামে পরিচিত। সাম্প্রতিককালে সুন্দরবনে মধু উৎপাদন আশংকাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। অপরিকল্পিত এবং অবৈধ উপায়ে মধু আরহণ এর প্রধান কারণ। ক্রমাগত বন উজাড়ের ফলে মৌমাছিরা সুন্দরবনে আর আগের মত মৌচাক বানাতে পারে না।

বিপদাপন্নতা

জীবিকা দল	বিপদাপন্নতা
জেলে	সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, মাছের প্রজাতি হ্রাস, নদী ভরাট, জলাবদ্ধতা ও জলদস্যু
ক্ষুদ্র কৃষক	কৃষি জমির অভাব, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, জমি বন্দোবস্ত ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি
গ্রামীন মজুরী শ্রমিক	কাজের অভাব ও স্বল্প/নিম্ন মজুরী
শহুরে শ্রমিক	সামাজিক নিরাপত্তহীনতা, কাজের অভাব, গৃহায়ণ সমস্যা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

জেলার প্রধান জীবিকা দল যেমন ক্ষুদ্র কৃষক, জেলে, গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিক ও চিংড়ি চাষী। এদের মধ্যে পরিচালিত এক সমীক্ষা (সিইজিআইএস, ২০০৩)-য় দেখা গেছে, জেলার ক্ষুদ্র কৃষকদের জীবন ও জীবিকায় কৃষি জমির অভাব, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, জমি বন্দোবস্ত ও দুর্বল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্যতম প্রধান বিপদাপন্নতার কারণ। অন্যদিকে সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, মাছের প্রজাতি হ্রাস, নদী ভরাট, জলাবদ্ধতা ও জলদস্যুদের আক্রমণ জেলেদের জীবনের প্রধান বিপদাপন্নতার কারণ। গ্রামীণ মজুরি শ্রমিকদের জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যাই প্রকট। দীর্ঘস্থায়ী কাজের অভাব ও স্বল্প বা নিম্ন মজুরী তাদের জীবনকে বিপদাপন্ন করে তোলে। সামাজিক নিরাপত্তহীনতা, কাজের অভাব, গৃহায়ণ সমস্যা ও আইন-শৃঙ্খলার অভাবে শহুরে শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ, ক্ষুদ্র কৃষক ও জেলেরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার। অন্যদিকে গ্রামীণ ও শহুরে শ্রমিকরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিপদাপন্ন।

জীবন ও জীবিকা

জনসংখ্যা

বাগেরহাট জেলার মোট জনসংখ্যা ১৫.১৬ লাখ, যার মধ্যে পুরুষ ৭.৮৬ লাখ এবং নারী ৭.৩০ লাখ। মোট জন সংখ্যার ৮৪% গ্রামে বসবাস করে এবং ১৬% শহরে বসবাস করে। প্রতি বর্গ কি. মিটারে ৩৮৩ জন লোক বাস করে।

মোট জনসংখ্যা	১৫.১৬ লাখ
পুরুষ	৭.৮৬ লাখ
নারী	৭.৩০ লাখ
শহুরে জনসংখ্যা	২.৪০ লাখ
পুরুষ	১.২৬ লাখ
নারী	১.১৪ লাখ
মোট গৃহস্থালির সংখ্যা	৩.২২ লাখ
শহরে	০.৫৪ লাখ
গ্রামীন	২.৬৮ লাখ
জনসংখার ঘনত্ব (বর্গ কি.মি.)	৩৮৩
গৃহ প্রতি গড় জনসংখ্যা	৪.৭
নবজাতক মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	৫৬
নারী প্রধান গৃহ (মোট গৃহস্থালির)	২.০০

জেলায় ০-১৪ এবং ৬০$^+$ বছর বয়সী জনগণ ও ১৫-৫৯ বছর বয়সী জনগণের মধ্যে নির্ভরশীলতা অনুপাত ০.৮০।

ঘর-গৃহস্থালি : শহুরে (৫৩,৬৪০) ও গ্রামীণ (২৬৮,০০০) মিলিয়ে বাগেরহাটে মোট গৃহস্থালির সংখ্যা ৩২১,৬৪০টি। প্রতিটি গৃহস্থের জনসংখ্যা গড়ে ৪.৭ জন (বি.বি.এস., ২০০১)।

১৯৯১ সালের আদম শুমারীতে দেখা যায় যে, জেলার মোট ঘরের ছাদ ৭৩% ছন, বাঁশ, পাটকাঠী ও পলিথিন দিয়ে তৈরী ও ২৫% ঘরের ছাদ ঢেউটিন বা টালীর তৈরী এবং ২% সিমেন্টের ছাদ। আবার এই সব ঘরের মধ্যে ৫৬% বেড়া পাটকাঠী ও বাঁশের, ৭% মাটি ও দেশীয় ইটের, ৩% বেড়া টিনের, ২৯% ঘরের বেড়া কাঠের এবং ৪% ঘরের দেয়াল পাকা।

জনস্বাস্থ্য

জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য জেলায় সুযোগ সুবিধা পর্যাপ্ত নেই। এই জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৬ এবং পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৮৭ (বি.বি.এস.- ইউনিসেফ ২০০১)।

ঘরের ছাদ	%
ছন, বাঁশ, পাটকাঠী, পলিথিন	৭৩
ঢেউটিন/টালী	২৫
সিমেন্টের ছাদ	২
ঘরের দেয়াল	
পাটকাঠী, বাঁশের তৈরি	৫৬
মাটি ও দেশীয় ইট	৭
টিন	৩
কাঠ	২৯
পাকা দেয়াল	৪

জেলায় ১২-৫৯ মাস বয়সীদের মধ্যে ৪% শিশুই অপুষ্টির শিকার। এই পরিসংখ্যানে আরও দেখা গেছে যে হাম, ডিপিটি, পোলিও রোগের টিকা নিয়েছে যথাক্রমে ৭৯%, ৭৯%, ৯৪% শিশু। এ ছাড়া ৩৯% শিশু ORT নিয়েছে (বি.বি.এস.- ইউনিসেফ, ২০০১)। বাগেরহাট জেলার ৮৫% গৃহে আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার আছে। জেলার জনগণের মধ্যে প্রধানত যে সব রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায় তা হল সর্দি, কাশি, জ্বর, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, পেপটিক আলসার, আমাশয়, টাইফয়েড ইত্যাদি।

পানি ও পয়ঃসুবিধা : জেলার ৫৬% ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা আছে। এ ছাড়া ৬৩% ঘরে কাঁচা পায়খানা এবং ৪% ঘরে কোন রকম পায়খানা নেই। শহরে এবং গ্রামের পয়ঃসুবিধার পার্থক্য তেমন নেই। শহরে ৩২% পাকা, ৬৫% কাঁচা পায়খানা ব্যবহার করে, অন্যদিকে গ্রাম এলাকায় ৩৪% পাকা, ৬২% কাঁচা পায়খানা ব্যবহার করে।

নিরাপদ পানির জন্য জেলার মোট গৃহস্থালির ৬২% কল অথবা নলকূপের পানি ব্যবহার করে বাকি ৩৮% পানি অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভরশীল। বাগেরহাটের বেশিরভাগ উপজেলায়ই আর্সেনিক পরীক্ষা করে দেখা গেছে ৬০% নলকূপে প্রতি লিটার পানিতে ৫০ মাইক্রোগ্রামের বেশি আর্সেনিক রয়েছে।

শিক্ষা

জেলার জনসাধারণের সাক্ষরতার হার সন্তোষজনক। সাত বছরের উপরে যে জনসংখ্যা রয়েছে তাদের সাক্ষরতা প্রায় ৫৮% (বি.বি.এস ২০০২), অন্যদিকে প্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ ১৫ বৎসরের উর্ধ্বে যাদের বয়স তাদের সাক্ষরতার হার ৬১%, এর মধ্যে পুরুষ ৬৪% এবং নারী ৫৭% (বিবিএস ২০০৩)।

অভিবাসন

বাগেরহাট জেলার মংলা বন্দর বাংলাদেশের অন্যতম সমুদ্র বন্দর। এখানে বন্দর স্থাপিত হওয়ার ফলে অন্যান্য জেলা থেকে বহু লোক এসে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে। বেশীরভাগ লোক কাজ ও বাণিজ্যের আশায় এখানে চলে আসে। মূলত বরিশাল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, এবং উত্তরাঞ্চল যেমন রংপুর, বগুড়া থেকে লোকজন অভিবাসিত হয়ে আসে। এই বন্দরে ইপিজেড স্থাপনের ফলে বিভিন্ন কলকারখানা গড়ে ওঠার প্রস্তুতি চলছে এবং বেশ কয়েকটি কলকারখানা গড়ে উঠেছে। ফলে এখানে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং ধীরে ধীরে একটি শহরে রূপান্তরিত হচ্ছে। এসকল কারণে এই স্থানে অভিবাসনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সামাজিক উন্নয়ন

বাগেরহাট জেলা সাক্ষরতার হার (৭$^+$ বছর), স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, শিক্ষার হার, স্কুল কলেজ, ব্যবসা-বাণিজ্য বিভিন্ন দিক থেকে সামাজিকভাবে এগিয়ে আছে তবুও সামগ্রীকভাবে উন্নয়নে এগুতে পারেনি। জেলায় মাথাপিছু আয় (১৬,৮৩৯) জাতীয় আয়ের (১৮,২৬৯) চেয়ে অনেক কম। (বি.বি.এস)

সাক্ষরতার হার (৭$^+$ বছর)	**৫৮%**
নিরাপদ পানির সুবিধাপ্রাপ্ত	**৬২%**
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	**৫৬%**
শয্যা প্রতি জনসংখ্যা	**৪৪৬৫ জন**

প্রধান জীবিকা দল

বাগেরহাট জনসংখ্যার বিরাট অংশই কৃষিজীবী। জেলার ৭৮% পরিবার কৃষির সাথে সংযুক্ত, এর পরেই রয়েছে জেলে। জেলার মোট জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। সুন্দরবন, জলাভূমি মোহনার অফুরন্ত মাছ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ এই জেলার মানুষের জীবন ও জীবিকায় প্রভাব ফেলে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা, নদী ভাঙন, সাইক্লোন, প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রম অবনতি, ভূমিহীণতা, দারিদ্র্য এবং জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি মানুষের জীবিকার ধরনে পরিবর্তন আনছে। চাষের জমির ক্রমবিভাজন একটি পরিবারকে কৃষি কাজের উপর আর নির্ভরশীল করে রাখতে পারছে না। তাই আজ বাগেরহাটের কৃষক থেকে ও পেশার পরিবর্তন চিংড়ি চাষী ও কৃষি শ্রমিকে পরিণত হবার ধারা চলছে। জেলার প্রধান জীবিকা দলগুলো হল ক্ষুদ্র কৃষক, গ্রামীণ শ্রমিক (প্রধানত কৃষি শ্রমিক), শহুরে শ্রমিক ও জেলে। এ ছাড়াও চিংড়ি চাষসহ অন্যান্য কাজকর্ম করে বাগেরহাটের মানুষেরা সংসার চালায়।

জীবিকা দল	পরিবারের সংখ্যা
ক্ষুদ্র কৃষক	**৫৬,২৮৬**
মধ্যম কৃষক	**২,৯৬৮**
বড় কৃষক	**২২৩**
কৃষি শ্রমিক	**৮৯,৮৬৮**

জেলে : বাগেরহাটের উপকূলীয় এলাকা ও চরাঞ্চলে বিশাল জেলে সম্প্রদায়ের বসবাস। মোহনা, গভীর সমুদ্রে ট্রলার অথবা নৌকা নিয়ে এরা মাছ ধরে। এদের অনেকেই বংশানুক্রমিকভাবে জেলে এবং প্রধানত হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

আবার মুসলমানদের অনেকেই মাছ ধরার পেশায় নিয়োজিত। জেলায় মোট ২৩,০০০ হাজার জেলে পারিবার মাছ ধরার সাথে কমবেশি সংশ্লিষ্ট।

উল্লেখ্য, এক সময় চট্টগ্রাম, বরিশাল, পটুয়াখালী, হাতিয়া, সন্দীপ ও কক্সবাজার অঞ্চল থেকে জেলেরা সুন্দরবনের আশপাশে অস্থায়ী বসতি গড়ে তুলে এক নাগাড়ে কয়েক মাস ধরে নদী, মোহনা ও গহীন সমুদ্রে মাছ ধরত। সাধারণত এসব জেলেরা পশুর, বলেশ্বর, পানগুছি, মংলা, হরিণঘাটা নদী, মোহনায় ও সুন্দরবনের মধ্যে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত মাছ ধরত। জলদস্যুদের আক্রমণ, মাছ ধরার ট্রলার ছিনতাই, জীবনের প্রতি হুমকি-ইত্যাদি কারণে সুন্দরবন উপকূলে পেশাদার জেলেদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

চিংড়ি চাষী : জেলায় চিংড়ি চাষীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। আশপাশের চিংড়ি চাষীদের সফলতা দেখে বর্তমানে বহু কৃষকই তাদের চাষের জমিকে চিংড়ি ঘেরে রূপান্তরিত করছে। ফলে কৃষক হয়ে যাচ্ছে চিংড়ি চাষী।

কৃষক : বাগেরহাট জেলায় ক্ষুদ্র কৃষিজীবী (যাদের মোট কৃষি জমির পরিমাণ ০.০৫-২.৪৯ একর) পরিবারের সংখ্যা ১৪৭,৯৬৫ (৫৯%); মধ্যম কৃষিজীবী (২.৫০-৭.৪৯ একর) পরিবার ৩,৭৯২২ (১৫%) টি এবং বড় কৃষক (৭.৫০$^{+}$ একর) পরিবার ৬,৭৮৪ (২.৭%)।

কৃষি শ্রমিক : কৃষি জমি ক্রমাগতভাবে কমে যাচ্ছে, আবার পরিবার বিভাজনের ফলে মাথাপিছু জমির পরিমাণও ব্যাপকভাবে কমে যাচ্ছে। ফলে কৃষক রূপান্তরিত হচ্ছে কৃষি শ্রমিকে। জেলার মোট কৃষি শ্রমিক গৃহস্থালির সংখ্যা ৮৯,৮৬৮টি, যা জেলার মোট পরিবারের ৩৬%।

শহুরে শ্রমিক : বাংলাদেশের অনান্য জেলার মত বাগেরহাট শহরেও শ্রমিক সংখ্যা বেড়েই চলছে। গ্রাম এলাকায় যথাযথ আয়ের উৎসের অভাব ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভূমিহীন মানুষ শহরে ভীড় জমায়। জীবিকার তাগিদে এরা কেউ কেউ নির্মাণ শ্রমিক, মুটে, মজুর, পরিবহন শ্রমিক, যোগালী হিসাবে কাজ করে। উল্লেখ্য, জেলায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা কম।

এ ছাড়া এই জেলায় রয়েছে অসংখ্য বাওয়ালী, মৌয়ালী ও চিংড়ি পোনা সংগ্রহকারীদের বসবাস। উল্লেখ্য, সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে জীবিকার তাগিদে প্রায় ২ লাখ নারী-পুরুষ চিংড়ি পোনা ধরার কাজে নিয়োজিত। তবে তাদের জীবন খুবই বিপদসংকুল।

অর্থনৈতিক অবস্থা

মাথাপিছু আয়	১৬,৮৩৯ টাকা
মোট শিল্পে আয়	১৪%
স্থির দরে বার্ষিক মোট আয় বৃদ্ধি	৬.১%
বিদ্যুৎ সংযোজন সম্পন্ন খানা	২১%

জেলার মোট সক্রিয় জনশক্তি, মোট আয়, মাথাপিছু আয় এবং মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ এই সবই সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থাকে নির্দেশ করে। ১৯৯৯-২০০০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সক্রিয় শ্রম জনশক্তির সংখ্যা ৮১৯ হাজার। এর মধ্যে ৬১% পুরুষ এবং ৩৯% নারী। ১৯৯৫-৯৬ সালে জনশক্তি ছিল ৭৭৭ হাজার। এর মধ্যে পুরুষ ও নারী যথাক্রমে ৫৯%, ৪১%। বর্তমানে জেলায় মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ১৬,৮৩৯ টাকা। মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.০৯ হেক্টর।

দারিদ্র্য

এই জেলায় অধিকাংশ লোক কৃষি নির্ভর। আর প্রধান ফসল হচ্ছে ধান। এ ছাড়াও রয়েছে কলা, পান, শবজি, ইক্ষু ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল ফসলই প্রকৃতি নির্ভর, তাই যখনই কোন দুর্যোগ আসে তখন এই সব ফসল নষ্ট হয়ে যায়

এবং কৃষকরা পরে যায় দুরবস্থায়। আর এই ক্ষতির পরিমাণ ২-৩ বছরে কাটিয়ে উঠতে পারে না। ফলে বহু কৃষক দিন দিন দারিদ্র্যতার মধ্যে চলে যায়। এ ছাড়াও নদী ভাঙনের ফলে ধীরে ধীরে বহু পরিবার নীরবে দারিদ্র্যের মধ্যে প্রবেশ করছে।

দরিদ্র	**৬৯%**
অতি দরিদ্র	**৩৭%**
ভূমিহীন	**৪৯%**
ক্ষুদ্র কৃষক	**৫৯%**

বাগেরহাট জেলার মোট জনসংখ্যার ৬৯% দরিদ্র এবং ৩৭% অতিদরিদ্র। এ ছাড়া জেলার মোট ৪৯% ভূমিহীন এবং ৫৯% ক্ষুদ্র কৃষক।

নারীদের অবস্থান

উপকূলীয় অঞ্চল ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাগেরহাট জেলার নারীদের অবস্থান ইতিবাচক। সম্প্রতি সিপিডি-ইউএনএফপিএ বাংলাদেশের ৬৪ জেলার মোট জনসংখ্যা, সাক্ষরতার হার এবং অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনসংখ্যার বিচারে নারী-পুরুষের অসমতার একটি ধারাক্রম নির্ধারণ করে একটি লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়নসূচক তৈরী করেছে। এতে দেখা যায় বাগেরহাট জেলা "স্বল্প মাত্রার লিঙ্গীয় অসমতার" এলাকা। জেলার প্রতিকূল পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন আর দারিদ্র্য-এ সবই পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান ও ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্থানীয় পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিবারিক বন্ধন, শিক্ষা নারীদের অবস্থানের পরিবর্তন বয়ে আনছে। নারীদের অবস্থানকে তথাকথিত কঠোর ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ না করে উন্নয়নের অংশীদার করে নেয়ার সময় এসেছে।

লিঙ্গ অনুপাত : বাগেরহাট মোট জনসংখ্যার ৪৮.১৬% নারী। জেলার লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০৮, যা সমাজে নারীর নেতিবাচক অবস্থানকে নির্দেশ করে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (০-১৪ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১১১। আবার প্রজননক্ষম বয়স দলে (১৫-৪৯ বছর) লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০০ (বি.বি.এস., ২০০৩)। জেলার নারীদের প্রজনন হার ২.৫৮ (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)। অর্থাৎ একজন নারী তার জীবদ্দশায় গড়ে ২টি সন্তান জন্ম দেয়। জেলার নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৬ জন, যা সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় বেশি। জেলার মাতৃ মৃত্যুর হার নানা প্রপঞ্চ দ্বারা প্রভাবিত। খাদ্যের অসম বন্টন, ঝুঁকিপূর্ণ সন্তান জন্মদান, আধুনিক স্বাস্থ্য সেবার অভাব যেমন ডাক্তার, ক্লিনিক ও হাসপাতালের অভাব মায়েদের মৃত্যুহারকে প্রভাবিত করে।

বৈবাহিক অবস্থা : ১৩% নারী অবিবাহিত, ৩২% নারী বিবাহিত এবং ৫% নারী তালাকপ্রাপ্ত বা স্বামী পরিত্যক্তা (বি.বি.এস., ২০০১)। এখানে বিয়ে নিবন্ধনের হার ৮১% (বি.বি.এস.-ইউনিসেফ, ২০০১)।

শ্রম বিভাজন : নারী-পুরুষের কাজের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। নারীদের ঘরের মধ্যে কাজ করার প্রবণতা বেশি। ঘরের বাইরে নারীরা প্রধানত পারিবারিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রম দেয়। তবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দারিদ্র্যের কষাঘাতে দরিদ্রতম নারীরা ঘরের বাইরে নানা ধরনের কাজের সাথে যুক্ত হয়। বেঁচে থাকার তাগিদে তারা শহরাঞ্চলে কাজ নেয়।

সমাজে নারীর গতি-প্রকৃতি কিছু প্রপঞ্চের উপর নির্ভরশীল। তথাকথিত পর্দা প্রথা, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মীয় অনুশাসন এই জেলার নারীদের গতিশীলতার প্রধান বাধা। তবে, নারীদের চলাচলের প্রকৃতি অনেকাংশেই সম্পদের সূচকের উপর নির্ভরশীল (কেয়ার, ২০০৩)। রাস্তা-ঘাটের ক্রম উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা, এনজিও-দের সচেতনতামূলক কার্যক্রম নারীদের বাইরের জগতের সাথে সম্পৃক্ত হতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

সক্রিয় শ্রমশক্তি : বাগেরহাট নারীদের মধ্যে সক্রিয় শ্রম শক্তির হার ক্রমশ কমছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে সক্রিয় শ্রম শক্তির অর্থাৎ ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে জনগণের ৪১% ছিল নারী। পরবর্তীতে ১৯৯৯-২০০০ সালে কমে গিয়ে হয়েছে ৩৯%। এই নারী শ্রম শক্তির মধ্যে ১৪% শহুরের এবং ৪০% গ্রামের। গ্রামীণ নারীরা প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে পড়েই হোক আর দারিদ্র্যের কারণেই হোক, তারা সেই চিরায়ত ধ্যান-ধারণা ও পারিবারিক উৎপাদন পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। গ্রামীণ কৃষিজীবী পরিবারের মধ্যে ২.৫৫% নারী পরের জমিতে শ্রম দেয়।

স্বাস্থ্যপুষ্টি : বাগেরহাটের নারীদের অতি অপুষ্টি, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কাঠামো ও সেবা ব্যবস্থা নারীর স্বাস্থ্য সার্বিকভাবে দুর্বল করেছে। জেলার মেয়ে শিশুদের মধ্যে অতি অপুষ্টির হার ৫%, যা জাতীয় হারের তুলনায় বেশি। পর্যাপ্ত

নিরাপদ পানি ও পয়:সুবিধার অভাব তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পর্যাপ্ত প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার অভাবে ৯৭% নারীই ঘরে সন্তান জন্ম দিয়ে থাকেন। ৭৫% ক্ষেত্রে আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশীরা সন্তান জন্ম নেয়ার সময় সহায়তা করেন, মাত্র ১৯.৫% নারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাইদের সেবা পান। আধুনিক ডাক্তারদের সেবাপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা মাত্র ৫.৫%।

- **জেলায় লিঙ্গ অনুপাত ১০০:১০৮**
- **৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে ৮৭) জাতীয় হারের (প্রতি হাজারে ৯০) তুলনায় কম।**
- **নারীদের মধ্যে সার্বিক (৭$^{+}$) ও প্রাপ্ত বয়স্ক (১৫$^{+}$) সাক্ষরতার হার ৫৬% এবং ৫৭% জাতীয় (৪১%) হারের তুলনায় অনেক বেশি।**
- **মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তির হার (১০৯%) জাতীয় হারের তুলনায় অনেক বেশি।**
- **জেলায় সক্রিয় জনশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ (৩৯%) জাতীয় হারের (৩৭%) চেয়ে বেশি।**
- **মেয়ে শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির হার জাতীয় হারের তুলনায় কম।**

শিক্ষা : জেলার ৭ বছর$^{+}$ বয়সী মেয়েদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৫৬% এবং প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের সাক্ষরতার হার ৫৭%। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাগেরহাটের মেয়েরা এগিয়ে আছে। মোট ছাত্র-ছাত্রীদের ৫০% মেয়ে শিশু, যাদের বয়স ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেয়ে শিশু ভর্তির হার ১০৯%। একই চিত্র দেখা যায় স্কুল ও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে। স্কুলের মোট ছাত্রছাত্রীর ৫২.৭৩% ছাত্রী। এবং মাদ্রাসায় মোট ছাত্রছাত্রীর ৫০.৭% ছাত্রী (ব্যানবেইস, ২০০৩)। তবে কলেজগুলোতে ছাত্রী সংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় কম। ৪৫% ছাত্রী জেলার কলেজগুলোতে লেখাপড়া করে। অর্থাৎ বাগেরহাট জেলার নারীর উচ্চ শিক্ষায় অংশগ্রহণ কম।

অবকাঠামো

রাস্তা-ঘাট ও নৌ-পথ

বাগেরহাট জেলার ২২১১ কি.মি. পাকা রাস্তা রয়েছে। ৩০ কি.মি. জাতীয় মহাসড়ক, ৭৮ কি.মি. আঞ্চলিক মহাসড়ক, ২৪৩ কি.মি. ফিডার রোড এ, ১৪৯ কি.মি. ফিডার রোড বি, এবং ৭৬৪ কি.মি., গ্রামীণ -১, ৯৪৭ কি.মি. গ্রামীণ-২ শ্রেণীর রাস্তা রয়েছে (বি.বি.এস ২০০৩ সি) । এ ছাড়াও ২৪ কি.মি. রেললাইন রয়েছে।

এই জেলায় নদী ও খাল মিলিয়ে ২০৫ কি.মি. নৌ পথ রয়েছে এবং এই নদীগুলো প্রায় ৭৬ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে আছে।

পোল্ডার

এক সময় 'অষ্টমাসী' বাঁধের সাহায্যে জেলার নিম্ন অঞ্চলকে প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করা হতো। তৎকালীন জমিদারদের প্রবর্তিত পানি ব্যবস্থাপনার এই স্থানীয় কৌশলটিই সেই সময়ে "পোল্ডার" -এর বিকল্প হিসেবে কাজ করত। পরবর্তীতে ষাটের দশক থেকে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষার তাগিদে বাগেরহাট জেলায় পোল্ডার নির্মাণের কাজ শুরু হয়।

বাগেরহাট জেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধীনে বেশ কয়েকটি পোল্ডার রয়েছে। যাদের মাধ্যমে ৬৬,০৫৯ হে. জমি রক্ষা করা হচ্ছে। পোল্ডার এলাকার মধ্যে রয়েছে ২২৫ কি. মি. প্রতিরক্ষা বাঁধ, ৪৩টি রেগুলেটর, ৬৭টি ফ্লাসিং আউটলেট ও ৫০৫ কি. মি. দীর্ঘ নিষ্কাশণ খাল। উল্লেখ্য, জেলার উপকূলবর্তী বাঁধ ও প্রতিরক্ষা বাঁধের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ বা তদারকি করার পর্যাপ্ত কোন ব্যবস্থা নেই। পানি ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি, অনিয়ম, এলাকাবাসীর অসচেতনতা, প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য সহযোগিতার অভাব, দুর্বল বাঁধ, বাঁধের ফাটল, জেলার নদী ভাঙনের তীব্রতাকে ত্বরান্বিত করে। ফলে এইসব এলাকায় লোনা জলের প্রবেশ, প্লাবন, ফসলহানি ইত্যাদি সমস্যা দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে।

পোল্ডার	বাঁধের মধ্যে সংরক্ষিত এলাকা (হে.)	চাষাবাদ-যোগ্য জমি (হে.)	বাঁধ (কি.মি.)	রেগুলেটর	ফ্লাসিং ইনলেট	খাল (কি.মি.)
পোল্ডার ৩৪/১	২২১২	১৬৬০	১০	৩	১	৩৩
পোল্ডার ৩৪/৩	৩৬৫৬	২৯৩০	১৭	৩	৬	৩৫
পোল্ডার ৩৫/১	১৩০৫৮	১০৭০০	৬৩	১৪	৩৬	২৫২
পোল্ডার ৩৫/৩	৬৭৯০	৫০৯০	৪০	৩	৮	৬৫
পোল্ডার ৩৬/১	৪০৩৪৩	২৮২৯০	৯৫	২০	১৬	১২০

ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

জেলার বিভিন্ন স্থানে মোট ৮২টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে (এল.জি.ই.ডি., ২০০৩)। জেলার মোট জনসংখ্যার ১১% জনগণ এতে আশ্রয় নিতে পারে। এগুলো ঘূর্ণিঝড়ের সময় জানমালের নিরাপত্তা দেয় আর অন্য সময়ে বিদ্যালয় ও খাদ্য গুদাম হিসেবে ব্যবহার হয়।

হাট-বাজার ও বন্দর

রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন, মানুষের চাহিদা, ভোগ্য পণ্যের বিস্তারের কারণে জেলায় হাট বাজারের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। জেলায় মোট ১৯৭টি হাট-বাজার রয়েছে (বি.বি.এস., ১৯৯৮)।

মংলা বন্দর

বাংলাদেশের অন্যতম সমুদ্র বন্দর। এই বন্দরে ১১টি জেটি, (মাল বোঝাই-খালাশের জন্য) ৭টি সেড, ৮টি ওয়ার হাউজ, ১টি ভাসমান জেটি ও সীম্যানদের জন্য ১টি রেস্ট হাউজ রয়েছে। জেলায় ৫টি স্থানীয় স্টীমার ঘাট রয়েছে। এ ছাড়াও ১৯টি লঞ্চ ঘাট রয়েছে।

বিদ্যুৎ/টেলিযোগাযোগ

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এ পর্যন্ত ৬৮৭৮০টি পরিবারকে (২৪৬৬০ শহরে এবং ৪৪১২০টি গ্রাম) বিদ্যুৎ পৌছে দিয়েছে। এই জেলায় মোট ৯টি উপজেলা রয়েছে প্রত্যেকটির সাথেই ঢাকা বা অন্যান্য জায়গার আধুনিক টেলিফোনের যোগাযোগ রয়েছে (বি.বি.এস., ২০০৩) ।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর তথ্য অনুযায়ী জেলায় সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে মোট ১,৩৪৩টি। এর মধ্যে সরকারি ৬০২টি এবং বাকী বেসরকারি ও অন্যান্য স্কুল। মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা সরকারি স্কুলে ৮৫,৮৯৫ জন এবং বেসরকারি স্কুলে ৯৩,২২০ জন এবং শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা ৬,৪৮০ জন। জেলায় নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায় ৪৬টি স্কুল রয়েছে এর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৮,৭৫৫ জন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ৪২৫ জন। জেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল রয়েছে ২৪২টি এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৮৭,২৩৭ জন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা ৪,০০৪ জন।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য মোট ২৯টি কলেজ রয়েছে। এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৬,২৩৭ জন। শিক্ষক ৮০৭ জন এবং শিক্ষিকা ১১৫ জন। এ ছাড়া বাগেরহাট জেলায় ১৪৬টি বিভিন্ন ধরনের মাদ্রাসা রয়েছে। এই সকল মাদ্রাসায় ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ২৫,১০৫ জন, এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ১২,৩৫৬ জন, ছাত্রীর সংখ্যা ১২,৭৪৯ জন (ব্যানবেইস, ২০০৩) ।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

জেলায় ১টি সরকারি জেনারেল হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৮টি, পল্লী স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৮টি, মাতৃ কল্যাণ কেন্দ্র ৩টি। পরিবার পরিকল্পনা সমিতি ১টি। জেলার সরকারী হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা ৩৪০টি। ৩,১৭৭ জন লোকের জন্য একটি শয্যা রয়েছে।

সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ২৬৮৩টি সমবায় সমিতি, ১৯৩টি বিভিন্ন ধরনের ক্লাব, ১৭২টি পোস্ট অফিস, ৭৬টি বিভিন্ন শাখা ব্যাংক, ৪২টি কম্যুনিটি সেন্টার ও ৪৮টি পেশাজীবী সংগঠন রয়েছে। ১টি জাদুঘর, ২টি নাট্যমঞ্চ, ১৯টি সিনেমা হল, ও ২০টি সাংস্কৃতিক সংগঠন রয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মোট ১৮৬০টি মসজিদ, ৫৭৫টি মন্দীর, ৭৬টি খ্রীষ্টান উপাসনালয় ও ৩টি তীর্থস্থান রয়েছে।

শিল্পাঞ্চল

বাগেরহাট জেলায় শিল্প কারখানার ঐতিহ্য বহু পুরান। একসময় বাগরেহাটে টেক্সটাইল মিল ও লবণ কারখানা ছিল। কেবলমাত্র ফকিরহাট থানায়ই ৪০টির মত লবণ ও গুড়ের কারখানা ছিল। এ জেলার সুন্দরবন এলাকার বহু কৃষক লবণ উৎপাদন কাজে নিয়োজিত ছিল। এ লবণ তৈরির শ্রমিকদের বলা হত মহিন্দর আর লবণের ব্যবসায় যারা নিয়োজিত ছিল তাদের বলা হতো মালঙ্গী।

বাগেরহাট জেলা শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ জেলা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ জেলায় একদিকে মংলা সমুদ্র বন্দর রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা, দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকার পর্যটনের আঞ্চলিক কেন্দ্র ও সমুদ্র উপকূলীয় মাছ ও চিংড়ির প্রক্রিয়াজাত করার জন্য বিভিন্ন রকমের শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে।

বাগেরহাট জেলায় মোট ২৯টি বরফকল, ২,২৫৮টি ধান ভাঙ্গা কল, ২৫টি আটার মিল, ২টি সিমেন্ট কারখানা, ১টি এল.পিজি প্লান্ট ও ৬৮টি 'স' মিল রয়েছে। এ ছাড়াও অনেক মিল কারখানা স্থাপনের কাজ চলছে।

হোটেল/অবকাশ কেন্দ্র

জেলা সদরে একটি সার্কিট হাউজ ও একটি ডাকবাংলা রয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় একটি করে ডাকবাংলো রয়েছে। এ ছাড়াও বন বিভাগের কয়েকটি ডাকবাংলো, পর্যটনের একটি মোটেল ও মংলা পোর্ট কর্তৃপক্ষের দুটি রেস্টহাউজ রয়েছে।

সেচ ও গুদাম

জেলার কৃষিজীবীরা আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী দুই ধরনেরই প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে। এল.এল.পি. দিয়ে জমিতে সেচ দেয়া হয় এবং পাওয়ার টিলার দিয়ে জমিতে চাষ দেয়া হয়। এই জেলায় ১,৯২৫টি এল.এল.পি. দিয়ে ১২,৮৮৬ হে. জমিতে সেচ দেয়া হয়। জেলায় ২১টি খাদ্য গুদাম রয়েছে যার ধারণক্ষমতা মোট ২৮,০০০ মে. টন। ১টি বীজ গুদাম রয়েছে যার ধারণ ক্ষমতা ৫০০ মে. টন এবং ১টি সার গুদাম (যার মোট ধারণ ক্ষমতা ২৬০ মে. টন) রয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প

উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০০৪-২০০৫ অনুসারে বাগেরহাট জেলায় সরকারি ১৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। যেসব সরকারি সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বন বিভাগ, মৎস্য অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, পল্লী বিদ্যুৎতায়ন বোর্ড ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা	প্রকল্প সংখ্যা
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	১
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১
বন বিভাগ	১
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	২
মৎস্য অধিদপ্তর	৩
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	১
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	১
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	১
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	১
বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	১

এ সকল প্রকল্পে যে সকল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা সহযোগিতা করছে সেগুলোর মধ্যে ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন, বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, নেদারল্যান্ডস সরকার, যুক্তরাজ্য সরকার, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইউনিসেফ ইত্যাদি অন্যতম।

বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জাতীয় NGO এই জেলায় কাজ করছে যেমন BRAC, PROSIKA, CARITAS। ২০০১ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, জাতীয় এনজিওগুলো বাগেরহাট জেলার ২৬% পরিবারের মধ্যে ৮৩,৭২৯টি লোন দিয়েছে। প্রতিটি লোন ৬,৮৭৬ টাকা করে মোট ৫৭৫.৭ মিলিয়ন টাকা বিলি করা হয়েছে। এছাড়াও স্থানীয় বেশ কিছু এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প নিয়ে কাজ করছে।

সুন্দরবন এলাকায় বন ও জলদস্যুদের তৎপরতা বৃদ্ধি

২২ দিনে ১৪ জেলে ও বাওয়ালী অপহৃত : হত্যা ৪

নিম্নচাপের প্রভাবে জলোচ্ছ্বাস : হাতিয়া মংলা শরণখোলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

দুবলারচরে বুধবার রাসমেলা শুরু

শিকারিরা প্রস্তুত, এবারও চলবে হরিণ নিধনযজ্ঞ!

দক্ষিণ উপকূলে 'শ্রমদাস' হিসেবে এবারও ব্যবহার হচ্ছে শিশু

আলোর কোল থেকে ১০ শিশু উদ্ধার

ভাইরাসের কারণে ১০ বছরে ৬ হাজার চিংড়ি চাষী নিঃস্ব হয়েছে

সুন্দরবন ও আশেপাশে ইলিশের আকাল, জলদস্যুর তাণ্ডব ॥ বিপর্যয়ের মুখে লক্ষাধিক মৎস্যজীবী

মংলা বন্দরের ১০ সহস্রাধিক শ্রমিক কর্মচারী এবার ঈদ করতে পারবেন না

সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা

বাগেরহাট জেলার মানুষের জীবনে প্রাকৃতিক এবং নিজেদের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ এবং প্রতিবন্ধকতার প্রভাব অপরিসীম। অপরিকল্পিত অবকাঠামো, সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং অসচেতনতার কারণে সামগ্রিক প্রতিবেশ ও পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। ২০০৩ সালে এই জেলার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনের সাথে এই বিষয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সমাজের মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ, সম্পদের বন্টন বা ব্যবহার, উন্নয়ন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের ফলে সৃষ্টি হওয়া কিছু প্রধান সমস্যার কথা আলোচিত হয়। এ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের গবেষণা (২০০২, ২০০৩) ও আলোচনা (২০০৩) থেকে জেলার মানুষের সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার যে চিত্র ফুটে উঠে তার উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে তুলে ধরা হল :

পরিবেশগত সমস্যা

অবাধ বৃক্ষ নিধন ও বন উজাড়, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, অনিয়ন্ত্রিত চিংড়ি পোনা আহরণ, ভারতের সাথে অভিন্ন নদ-নদীর পানি বন্টন সমস্যা, ভূ-গর্ভস্থ পানির অত্যধিক আহরণ, অপরিকল্পিত বাঁধ, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও সর্বোপরি পরিবেশ সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব সুন্দরবনসহ জেলার সামগ্রিক পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলছে।

জলাবদ্ধতা : এই জেলায় জলাবদ্ধতা একটি বড় সমস্যা। বাগদা চিংড়ি চাষের জন্য চাষীরা ঘেরে বা জমিতে জোয়ারের লোনা পানি তুলে আটকে রাখে। উঁচু আইল তৈরির ফলে জলাবদ্ধতা দেখা দেয় । জোয়ারের পলি পরে নালা-খালগুলো ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলেও পানি বের হতে পারে না। ফলে কৃষি জমিতে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। এ ছাড়াও অপরিকল্পিতভাবে রাস্তাঘাট নির্মাণের কারনে জলাবদ্ধতা আরো প্রকট হয়। বিশেষ করে বৃষ্টি হলে বা ভরা জোয়ারে কৃষি জমির পানি সহজে বের হয় না। ফলে বীজতলা, সবজি ক্ষেত এমন কি নিচু বাড়িঘরেও পানি ওঠে।

লবণাক্ততা : মাটি-পানির লবণাক্ততা জেলার মানুষের জীবনকে আক্রান্ত করছে বেশি। গ্রামে খাবার পানির সংকট দিনদিন তীব্র হচ্ছে। কৃষকরা সেচের পানি পাচ্ছে না। বাগেরহাট জেলার খাবার পানিতে লবণের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। ফলে স্বাভাবিক কৃষি কাজ ও গাছ-পালার বৃদ্ধি ব্যাহত হচ্ছে। ভারতের পরিকল্পিত নদী সংযোগ প্রকল্প (River Link Project) বাস্তবায়িত হলে ভূ-উপরিস্থিত পানির লবণাক্ততা আরো বাড়বে বলে আশংকা করা হচ্ছে। মাটিতে লবণ বেড়ে যাওয়ায় গ্রীষ্মকালীন ফসল (আউশ), শুকনা মৌসুমের ফসল (বোরো) ও রবি শস্য উৎপাদন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হচ্ছে । জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে, যা জেলার কৃষিখাতকে প্রভাবিত করছে।

> **পরিবেশগত সমস্যা**
> - জলাবদ্ধতা
> - লবণাক্ততা
> - সাইক্লোন
> - কাল বৈশাখী/টর্নেডো
> - নদী ভরাট
> - নদী দূষণ
> - বাগদা চাষ
> - সুন্দরী গাছের আগামরা রোগ
> - জীব প্রজাতি হ্রাস
> - আর্সেনিক দূষণ
> - ভূমি অব্যবস্থাপনা
> - জলবায়ুর পরিবর্তন
> - সুন্দরবন এলাকায় তেল গ্যাস অনুসন্ধান
>
> **আর্থ-সামাজিক**
> - নগর ও শিল্প দূষণ
> - বনদস্যু
> - বাণিজ্য সংকট
> - আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি
>
> **পর্যটন বিষয়ক সমস্যা**
> - উপযুক্ত অবকাঠামো অভাব
> - নিরাপত্তা ব্যবস্থা
> - পর্যটন গাইড
>
> **যোগাযোগ**
> - অনুন্নত অবকাঠামো উন্নয়ন
> - অবকাঠামো নির্মাণে সমস্যা

সাইক্লোন : সাইক্লোন ও জলোচ্ছাসের কারণে সুন্দরবন উপকূলের মানুষের জীবন চরমভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। আপদকালীন নিরাপত্তার অভাব ও অপর্যাপ্ত বিপদ সংকেত জেলার মানুষ ও সম্পদের অবর্ণনীয় ক্ষতি সাধন করে।

কাল বৈশাখী/টর্নেডো : প্রতি বছর মার্চ থেকে জুন মাস পর্যন্ত কাল বৈশাখীর আশংকা থাকে। কাল বৈশাখীর আঘাতে ক্ষেত-খামার জেলার জনপদ, গো-সম্পদ ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হয়।

নদী ভরাট : জেলার নদী, নালা, খালগুলো ক্রমশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তাই জেলার সার্বিক পানি ব্যবস্থাপনা আজ ভয়াবহ হুমকির সম্মুখীন। বিশেষ করে সুন্দরবনের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ভোলা নদী সম্পুর্নভাবে ভরাট হয়ে গেছে।

নদী দূষণ : বাগেরহাট জেলার দরাটানা, বলেশ্বর, পশুর ও মংলা নদী আজ অতিমাত্রায় দূষণের শিকার। লবণাক্ততা বৃদ্ধি, চিংড়ি ঘের, চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার বর্জ্য, ফেরী ঘাটের বর্জ্য পদার্থ নদীর পানিকে দূষিত করে চলেছে। উল্লেখ্য, জেলায় বর্জ্য পানি ব্যবস্থাপনা বা Waste Water Treatment সুবিধা নেই।

বাগদা চাষ : অপরিকল্পিত বাগদা চাষ জেলার পরিবেশগত বিপন্নতা বাড়িয়ে তুলছে। কেননা চিংড়ি চাষের কারণে মাটির লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। গত বিশ বছরে জেলার ফসল উৎপাদন অনেক কমে গিয়েছে।

সুন্দরী গাছের আগামরা রোগ : আগামরা রোগে সুন্দরী গাছের কাঠের গুণাগুন নষ্ট হয়। ছত্রাক আক্রান্ত গাছের ৪২% নষ্ট হয়। যার অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। এই রোগে সুন্দরবনের প্রায় ৪৩টি কম্পার্টমেন্ট আক্রান্ত হয়েছে।

জীব প্রজাতি হ্রাস : অবৈধ উপায়ে বাঘ, হরিণ, পাখী ও অন্যান্য প্রাণী শিকার প্রজাতি বিলীনে ত্বরান্বিত করছে। সাগর উপকূলে অতিরিক্ত মাছ আহরণ ও চিংড়ি পোনা ধরা সাগরের মাছের প্রজাতি হ্রাস করছে।

আর্সেনিক দূষণ : জেলার ৬০% নলকূপে আর্সেনিক দূষণ গ্রহণযোগ্য মাত্রার (৫০ মাইক্রোগ্রাম/লিটার) চেয়ে বেশি।

ভূমি অব্যবস্থাপনা : খাস জমি বন্দোবস্ত, চিংড়ি ঘেরের জমি দখল ঘেরে লোনা পানির অনুপ্রবেশ ইত্যাদি কারণে জেলার ভূমি ব্যবস্থাপনায় সংকট দেখা দিয়েছে। প্রশাসনের সহযোগিতায় ও মাস্তানদের দৌরাত্মে বহু জমি চিংড়ি ঘেরের জন্য লীজ দেয়া হচ্ছে। আশপাশের ধানী জমির সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি তোয়াক্কা না করে মাছের ঘেরে লোনা পানি ঢুকিয়ে অবাধে চিংড়ি চাষ হচ্ছে।

জলবায়ুর পরিবর্তন : জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে জেলার পেশাজীবী শ্রেণীর জীবন ও জীবিকায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। অনাকাংঙ্খিত এই জলবায়ুর পরিবর্তন একদিকে যেমন ক্ষুদ্র কৃষক ও জেলেদের জীবনে "আয়ের নিরাপত্তাহীনতা" কে তীব্রতর করে তুলছে, অন্যদিকে তেমনি নারী মজুরি-শ্রমিক ও গৃহিণীদের "সম্পদ ও নিরাপত্তা" কে সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

সুন্দরবন এলাকায় তেল গ্যাস অনুসন্ধান : পরিবেশবাদীদের মতে, সুন্দরবন এলাকায় তেল গ্যাসের অনুসন্ধানী কার্যক্রম সুন্দরবনের পরিবেশকে অল্প সময়ের মধ্যে বিনষ্ট করবে। কেননা জ্বালানি উদগীরণ ও খনন কালে উচ্চ মাত্রার শব্দ দূষণ এবং হাইড্রোকার্বন থেকে বনাঞ্চলের মাটি দূষিত হয়ে পড়বে। এতে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক আবাসভূমির পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। ভূ-তত্ত্ববিদ ও দুর্যোগ বিশারদদের মতে, তেল গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন উভয়ই উপকূলীয় অঞ্চলকে নিম্ন ভূমিকম্প ঝুঁকির এলাকা থেকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় পরিণত করতে পারে।

আর্থ-সামাজিক সমস্যা

নগর ও শিল্প দূষণ : জেলার শিল্প কারখানা ও শহরের বর্জ্য স্থানীয় পরিবেশকে বেশ দূষিত করছে।

বনদস্যু : সুন্দরবন, উপকূল এলাকা ও গহীন সমুদ্রে বনদস্যু ও জলদস্যুদের দৌরাত্ম্য, জেলেদের জীবন জীবিকায় বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

বাণিজ্য সংকট : মান নিয়ন্ত্রন, অবকাঠামোর অভাব, প্রক্রিয়াজাতকরন সুবিধার অভাব মাছ রপ্তানিতে সমস্যা সৃষ্টি করছে।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি : গোটা সুন্দরবন এলাকা এবং গভীর সমুদ্র বনদস্যু ও জলদস্যুদের অভয়াশ্রমে পরিণত হয়েছে। বনদস্যুদের ভয়াবহ দৌরাত্ম্যের কারণে সুন্দরবনের বনজ সম্পদ আহরণের মৌসুমে বাওয়ালী ও তাদের মহাজনরা গহীন বনে যেতে পারে না। শুধু তাই নয়, বাগেরহাটের সর্বত্রই চিংড়ি চাষকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব সংঘাত, মাস্তানি এমনকি খুন হচ্ছে। প্রতি বছর গোলপাতা ও অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণের মৌসুম আসলেই বনদস্যুরা বেশি তৎপর হয়ে উঠে। তারা বাওয়ালী ও মহাজনদের জিম্মি করে চাঁদা আদায় করে। অন্যদিকে জেলেদের মাছ ধরা ট্রলার ও নৌকা থেকে মাছ, জাল, ডিজেলসহ টাকা পয়সা লুট করে। কোস্ট গার্ড ও নৌবাহিনীর পর্যাপ্ত টহল না থাকার কারণে জেলেদের জান ও মালের নিরাপত্তা নেই। জলদস্যুদের এই অপতৎপরতা প্রত্যক্ষভাবে দেশের রাজস্ব আয় ও জেলেদের জীবিকা নির্বাহে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। উল্লেখ্য, মুক্তিপণের দাবীতে অপহরণ সুন্দবনের একটি অতি পরিচিত ঘটনা।

পর্যটন বিষয়ক সমস্যা

উপযুক্ত অবকাঠামো অভাব : সুন্দরবন ও বাগেরহাট ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলোতে পর্যটন শিল্প বিকাশের অন্তরায় হল উপযুক্ত অবকাশ কেন্দ্র ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা : সুন্দরবনের ভেতরে বা গহীনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। কেবলমাত্র নৌ-পথেই সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য স্থানগুলোতে পৌছানো সম্ভব, আর নৌ-পথ নানা ধরনের বিড়ম্বনা ও বিপদ আশংকাপূর্ণ।

পর্যটন গাইড : জেলায় উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সচেতন পর্যটন গাইডের সংখ্যা নগণ্য।

যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা

অনুন্নত অবকাঠামো : শহরের রাস্তা-ঘাট, বন্দর ও পুরান নৌঘাটগুলোর অবস্থা শোচনীয়। সংস্কারের অভাব ও মাস্তানদের দৌরাত্ম্যের কারণে জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ছে।

অবকাঠামো নির্মাণে সমস্যা : প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, দীর্ঘসূত্রতা আর স্থানীয় চাঁদাবাজদের হুমকির মুখে জেলার প্রধান দুটি সেতু (রূপসা) নির্মাণের কাজ পিছিয়ে পড়েছে। রূপসা-বাগেরহাট রেললাইন বন্ধ হয়ে নিম্ন আয়ের লোকদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শ্রমিকদের জন্য একটি বড় সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

Shrimp farmers see output boom on new method

বাগেরহাটে কাজিদের যৌতুক প্রতিরোধের প্রতিশ্রুতি

Govt hatchery raises hope among shrimp farmers

Distribution from Patuakhali hatchery starts: 40 lakh fries to be produced annually

চামড়া ও ৫২টি ফাঁদসহ সুন্দরবনে ৬ হরিণ শিকারি আটক

বাগেরহাটে দুই ডিআইজির যৌথ সভা

সন্ত্রাস দমনে খুলনা ও ঢাকা রেঞ্জ পুলিশের নতুন কর্মপরিকল্পনা

PL infection in S-W region

SSOQ comes to rescue shrimp farmers

সম্ভাবনা ও সুযোগ

প্রাকৃতিক সুন্দরবন, সামুদ্রিক ও মিঠাপানির মৎস্য সম্পদ, মংলা বন্দর, ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি নিয়ে পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা ও মানব সম্পদের এক বিশাল সমারোহ রয়েছে এই জেলায়। জেলা ও মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের গণমানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের (২০০৩) মাধ্যমে জেলার প্রধান সম্ভাবনাময় দিকগুলোর স্পষ্ট ঈঙ্গিত মেলে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনউদ্যোগের কয়েকটি সম্ভাবনাময় দিক হচ্ছে -

প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহার

সুন্দরবন : সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদের একটি উপযুক্ত সমীক্ষা হওয়া দরকার। এতে সম্পদের সুষ্ঠু ও টেকসই ব্যবস্থাপনার দুয়ার খুলে যাবে। স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে এটি করা যেতে পারে।

উদ্ভিদ ও জীব বৈচিত্র্য : সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ "বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান" রক্ষায় একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। কুমির অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা, রোগাক্রান্ত সুন্দরী গাছ কেটে ফেলা কয়টি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

সুন্দরবনের মধু : প্রতি বছর সুন্দরবন থেকেই প্রায় দুই লাখ লিটার মধু উৎপাদিত হয়। দেশে এবং বিদেশে সুন্দরবনের মধুর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

আন্তঃসীমান্ত শান্তি পার্ক : সুন্দরবনের বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তে মূল্যবান জীব প্রজাতি যেমন রয়েল বেঙ্গল টাইগারের সঠিক গণনা নিশ্চিত করতে ও শিকার প্রতিরোধে আন্তঃ সীমান্ত শান্তি পার্ক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাটি সম্ভাবনাময়। উল্লেখ্য, এর আশু বাস্তবায়নে দুই দেশের উচ্চ পর্যায়ে বৈঠক ও আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

চরাঞ্চল : বাগেরহাট জেলার মূল ভূ-খণ্ডের সাথে সংযুক্ত সব ক'টি চরে পরিকল্পিত উপায়ে মাছের চাষ, নিবিড় বাগদা চাষ, গো-চারণ, কৃষি ও বনায়নের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। জেলেদের আধুনিক যন্ত্রচালিত ট্রলার ও শুঁটকি শ্রমিকদের আধুনিক পদ্ধতিতে শুঁটকি তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়া হলে তারা উন্নতমানের শুঁটকি তৈরি করতে সক্ষম হবে।

<u>প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবহার</u>
- **সুন্দরবন**
- **উদ্ভিদ ও জীব বৈচিত্র্য**
- **সুন্দরবনের মধু**
- **আন্তঃসীমান্ত শান্তি পার্ক**
- চরাঞ্চল
- **মোহনা, নদী, বিলের মাছ**
- **মৎস্য অভয়ারণ্য**
- **খনিজ**

<u>কৃষি উন্নয়ন</u>
- **চিংড়ি চাষ**
- **চিংড়ি ঘেরের আইলে সবজি চাষ**
- **ধানক্ষেতে মাছ চাষ**
- **হ্যাচারী**
- **কাঁকড়া চাষ**

<u>আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন</u>
- **বাঁধ সংরক্ষণ**
- **বাওয়ালী ও মৌয়ালীদের জীবনবীমা কার্যক্রম**
- **নগরায়ণ**

<u>শিল্প উন্নয়ন</u>
- **ব্যক্তিখাত**
- **শিল্প ও বাণিজ্য-ইপিজেড**
- **শিল্পাঞ্চল**
- **শুঁটকি**
- **পর্যটন শিল্প**
- **পর্যটন অবকাঠামো**

<u>যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন</u>
- **বিমান বন্দর**
- **ব্রীজ বা সেতু নির্মাণ**
- **নৌ-রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা**

মোহনা, নদী ও বিলের মাছ : উপকূলের উপরের ও গভীর স্তরের মাছ, মোহনা, নদী, বিলের মাছের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। যথাযথ আইন প্রয়োগ, জেলেদের সুবিধা প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধি ও জলদস্যুদের প্রতিরোধের মাধ্যমে উপকূলে মাছের প্রজাতি রক্ষা ও বাণিজ্যিক আহরণ করা সম্ভব। উন্নত প্রযুক্তি ও মাছ ধরার শক্তিশালী জেলে নৌকা (লঞ্চ) ঋণের মাধ্যমে জেলেদের দেয়া হলে জেলেরা গভীর সাগরের অফুরন্ত মাছ ধরবে এবং অগভীর সাগরের উপর চাপ কমবে এবং মাছের পোনা রক্ষা পেয়ে গভীর সাগরের মাছ উৎপাদন বাড়বে।

মৎস্য অভয়ারণ্য : চতুর্থ মৎস্য প্রকল্প, ১৯৯৯ (মৎস্য অধিদপ্তর) -এর তথ্য অনুসারে সমগ্র বাগেরহাট জেলার সুন্দরবন এলাকায় মৎস্য অভয়ারণ্য স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

খনিজ : জেলার খনিজ সম্পদের (পীট কয়লা, তেল, গ্যাস) মোট পরিমাণ নির্ণয় করে উপযুক্ত উপায়ে এইসব খনিজ পদার্থ উত্তোলন করতে পারলে দেশের চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের বড় সম্ভাবনা রয়েছে।

কৃষি উন্নয়ন

চিংড়ি চাষ : চিংড়ি চাষ, উৎপাদনের পরিমাণ ও রপ্তানিতে বাগেরহাট জেলা দেশের অন্যতম পথিকৃৎ। তাই নিবিড় ও পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষের প্রাথমিক পর্যায় অর্থাৎ হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদন থেকে শুরু করে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এতে মানসম্মত চিংড়ি উৎপাদন ও রপ্তানি নিশ্চিত হবে ও আন্তর্জাতিক বাজারে এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে, দেশের অর্থনীতি জোরদার হবে।

চিংড়ি ঘেরের আইলে সবজি চাষ : বাগেরহাট জেলায় চিংড়ি চাষীরা ঘেরের আইলে সবজি চাষের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কেননা এতে ঘেরের আয় বেড়ে দ্বিগুন হয়।

ধান ক্ষেতে মাছ চাষ : বাগেরহাট জেলায় ধান ক্ষেতে মাছ চাষ থেকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা নিশ্চিত করা গেলে কৃষকরা এই উৎপাদনমুখী চাষ পদ্ধতিতে আরো আগ্রহী হয়ে উঠবে।

হ্যাচারী : জেলায় আরো কয়টি চিংড়ি হ্যাচারী স্থাপন করার সম্ভাবনা রয়েছে।

কাঁকড়া চাষ : সুন্দরবন উপকূলে কাঁকড়া (Mud crab) চাষ করা সম্ভব। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও বিজ্ঞানসম্মত কৌশল অবলম্বনে কাঁকড়া চাষের বিকাশ ঘটানো সম্ভব।এতে দরিদ্র জনসাধারণের কর্ম সংস্থান ও আয়ের পথ খুলে যাবে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

বাঁধ সংরক্ষণ : বাঁধ সংরক্ষণে বাস্তব, সময়োচিত উদ্যোগ ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। ভাঙন রোধ, লোনাজলের প্রবেশ গতিরোধ, ফসল রক্ষা, শহর ও গ্রামাঞ্চল রক্ষায় সরকার ও স্থানীয় জনসাধারণের ঐকান্তিক অংশগ্রহণ থাকা প্রয়োজন।

বাওয়ালী ও মৌয়ালীদের জীবনবীমা কার্যক্রম : সুন্দরবনের এই স্বতন্ত্র ধারার জীবিকা গোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা প্রদানের ক্ষেত্রে জীবনবীমা কার্যক্রম চালু করা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এর ফলে তাদের সচেতনতা সৃষ্টিসহ সঠিক উপায়ে বনজ সম্পদ আহরণের পথ প্রশস্ত হবে। উল্লেখ্য, এই ধরনের জীবনবীমা কার্যক্রম চিংড়ি পোনা সংগ্রহকারী ও জেলেদের জন্যও চালু হতে পারে।

নগরায়ণ : বাগেরহাট ও মংলা শহরে বড় বড় কলকারখানা গড়ে ওঠার পেছনে নগরায়ণের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। একযোগে বিদ্যুৎ, পানি, রেল-নৌ-সড়ক যোগাযোগের সুবিধা জেলার কৃষি ও অর্থনীতিতে সাফল্য বয়ে আনবে। এর ধারাবাহিকতা রক্ষায় জেলায় নগরায়নের বিস্তৃতি ও বাগেরহাট শহরের আধুনিকায়নের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

শিল্প ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

ব্যক্তিখাত : জেলায় গত ২০ বছরে ব্যক্তিখাতের কার্যকলাপ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। চিংড়ি উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও রপ্তানিসহ এবং পর্যটন শিল্পে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ জেলার অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়তা করবে।

শিল্প ও বাণিজ্য-ইপিজেড : মংলা ইপিজেড জেলা শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে। এই মংলা বন্দরকে কেন্দ্র করে দেশে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এক রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং দেশে যে তিনটি ইপিজেড স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তার একটি মংলায়। প্রাথমিকভাবে ১৪০ একর জমির উপর এই ইপিজেড স্থাপনের জন্য প্লটের সংখ্যা হবে ১৬২টি। মোট ৪৬০ একরের উপর এই ইপিজেড স্থাপন করা হয়।

খুলনার রূপসা সেতুর কাজ শেষ হলে মংলা বন্দরের সাথে দেশের উত্তরাঞ্চলের পথ আরো সহজ হয়ে যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই বন্দরের সাথে সার্কভুক্ত দেশ নেপাল ও ভুটানের বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে।

শিল্পাঞ্চল : প্রতিটি উপজেলায় শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলতে পারলে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে এবং অন্যদিকে উৎপাদন বাড়বে।

শুঁটকি : বাগেরহাট জেলার দুবলার চরের শুঁটকি দেশে বিদেশ খুবই জনপ্রিয়। এই স্থানটি সমুদ্রের একটি দ্বীপ চর। যথাযথ আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে এই জেলায় শুঁটকি শিল্পের বিকাশ ঘটানো সম্ভব এবং এ থেকে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবার সম্ভাবনাও প্রবল। চরাঞ্চলে স্বল্প দামের "সোলার টানেল ড্রায়ার" পদ্ধতিতে পুষ্টি ও গুণগত দিক থেকে উন্নতমানের শুঁটকি তৈরি করা সম্ভব।

পর্যটন শিল্প : বাগেরহাট জেলার পুরাকীর্তি, দর্শনীয় স্থান, সুন্দরবনের আকর্ষণে পর্যটকদের থাকবার, খাবার ও অন্যান্য সুবিধাদি গড়ে উঠছে। ভবিষ্যতে এ শিল্পের আরো বিকাশ হবে। এ ছাড়াও জেলার দর্শনীয় স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে। এ জেলার পর্যটনের আকর্ষন যথেষ্ট রয়েছে।

পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়ন : মংলা বন্দরকে কেন্দ্র করে এবং সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার বড় সুযোগ রয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এটি আঞ্চলিক পর্যটন কেন্দ্র তৈরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, যা বাগেরহাট জেলার মংলায় স্থাপিত হওয়ার কথা। প্রতি বছর বহু পর্যটক মংলা হয়ে সুন্দরবন ভ্রমণে আসছে। সরকার ইতোমধ্যে বাগেরহাটের পুরাকীর্তির কথা চিন্তা করে মংলাকে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান পর্যটনকেন্দ্র করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং মংলায় একটি মোটেল তৈরি করেছে। বাগেরহাট জেলার উল্লিখিত দিকগুলো সঠিকভাবে কাজ করলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সকল প্রকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দুয়ার খুলে যাবে।

বিমান বন্দর : দেশ স্বাধীন হবার পর আবার ১৯৮৯ সালে খুলনা-মংলা রোডের মিলন স্থানে বাগেরহাট জেলার ফরিহাট থানার পিলজঙ্গ নামক স্থানে বিমান বন্দর স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। এই প্রস্তাব আবার থেমে যায়। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এ স্থান বাগরেহাট শহর থেকে ৩২ কি.মি., খুলনা ও মংলা থেকে ২১ কি.মি. এবং গোপালগঞ্জ সদর থেকে ৫৮ কি.মি. দুরে অবস্থিত। এই বিমান

বন্দরের নাম রাখায় হয় খানজাহান আলী বিমান বন্দর। এ বিমান বন্দরটি বাস্তবায়িত হলে বাগেরহাট, খুলনা, পিরোজপুর গোপালগঞ্জ এলাকার জনগণ ও মংলা বন্দরের ব্যবসা-বাণিজ্যে ও পর্যটনের ক্ষেত্রে উন্নয়নের দ্বার খুলে যাবে, নিয়ে আসবে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি।

ব্রীজ বা সেতু নির্মাণ : জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্রীজ বা সেতু নির্মাণ একটি যথোপযুক্ত উদ্যোগ। সাম্প্রতিক সময়ের “দরাটানা সেতু, মোল্লার হাট সেতু, বলেশ্বর সেতু” নির্মাণ অন্যতম সংযোজন এবং রূপসা সেতু নির্মাণ শেষের পথে, যা বাগেরহাটের সাথে দেশের অন্যান্য জেলার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

নৌ-রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন : নদী বন্দরগুলোর উন্নয়ন ও সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপনের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, যাতায়াতের উন্নয়ন ও আঞ্চলিক দূরত্ব কমে গেছে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরো সম্ভাবনা রয়েছে।

ভবিষ্যতের রূপরেখা

	২০১৫	২০৫০
মোট লোকসংখ্যা (লাখ)	১৬.৪৯	২০.৮০
পুরুষ	৮.৫৮	১০.৪০
নারী	৭.৯০	১০.৪০
গ্রামীণ জনসংখ্যা	১৩.১৭	১৩.৮২
শহুরে জনসংখ্যা	৩.৩২	৬.৯৮

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল বাস্তবায়নের শেষ বছর ২০১৫ সাল। এ সালে বাগেরহাট জেলায় জনসংখ্যা ১৬.১৬ লাখ (২০০১) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৬.৪৯ লাখ হতে পারে। এ বিপুল জনগোষ্ঠীর এবং জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থানের নানান পথ তৈরি করতে হবে। জেলার উন্নয়নে যে সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো যায় তা হল পর্যটন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, মংলা বন্দর এবং শিল্প কারখানা ইত্যাদি। অন্যদিকে যে সব বিষয়ে বিশেষ মনযোগ দেয়া দরকার তা হল জলাবদ্ধতা নিরসন, পানি ব্যবস্থাপনা, মাটি-পানির লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, নদী শাসন, সুন্দরী গাছের আগামরা রোগ, জীব প্রজাতি হ্রাস, নগর ও শিল্প দূষণ, পর্যটন শিল্প, নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি।

অতি সম্প্রতি সরকারের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সাথে আই.ইউ.সি.এন এর এক সংলাপ অনুষ্ঠানে বলা হয়, সরকার যথাযথ সহায়তা দিলে ২০০৮ সাল নাগাদ চিংড়ি রপ্তানি থেকে বর্তমানের তুলনায় পাঁচ গুন বেশি রপ্তানি আয় করা সম্ভব। এরই সূত্র ধরে আরো বলা হয়, দেশের চিংড়ি চাষে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে মান সম্পন্ন পরিবেশ বান্ধব ও সামাজিকভাবে অনুকূল চিংড়ি চাষ প্রক্রিয়ার প্রচারণা ও চর্চা প্রয়োজন।

সুন্দরবনকে কেন্দ্র করে জেলার সম্ভাবনার বিষয়টির যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে পর্যটন সম্ভাবনা, জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনজ সম্পদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। উল্লেখ্য, আন্তঃসীমান্ত শান্তি পার্ক বাস্তবায়নের ফলে মূল্যবান জীব প্রজাতির সঠিক গননা নিশ্চিত করা ও সংরক্ষণ সম্ভব হবে। বাওয়ালী ও মৌয়ালীদের জীবনবীমা কার্যক্রম সঠিক উপায়ে বনজ সম্পদ আহরণের সুযোগ নিশ্চিত করবে ।

দক্ষিণাঞ্চলের সম্ভাবনার দুয়ার উম্মোচনে রূপসা সেতু ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়। রূপসার তীরে জনগণের নাগরিক সুবিধা সম্প্রসারণসহ পর্যটন শিল্প সম্ভাবনা বিকাশে সাহায্য করবে। এতে করে সুন্দরবন ও বাগেরহাট হযরত খানজাহান আলীর পুরাকীর্তি সমূহে পর্যটন আকর্ষণ বাড়ানো সম্ভব হবে। যেহেতু সুন্দরবন এলাকা দেশের স্থল যোগাযোগ নেটওয়ার্কের বাইরে অবস্থিত, তাই রূপসা সেতুর মাধ্যমে বাগেরহাট শহর ও খুলনা, মংলা বন্দরের সাথে সুন্দরবন পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। রূপসা সেতু নির্মাণের ফলে নদী দূষণ কমবে। এ ছাড়া জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হবে। নিত্যনৈমিত্তিক দুর্ভোগ, দুর্ঘটনা আর অনিশ্চয়তার হাত থেকে মানুষ রেহাই পাবে।

মানব সম্পদের উন্নয়নে জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। আর তাই জেলার নিকটবর্তী জেলায় বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী কলেজ ও মেডিকেল কলেজে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ও সার্বিক মান উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

এ ছাড়া জেলার সামগ্রিক উন্নয়নে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেয়া প্রয়োজন। এতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানুষের নিজেদের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতির হার কমে যাবে।

এ ছাড়া জেলার ৯টি উপজেলায় ৯টি শিল্পাঞ্চল করা যেতে পারে। শিল্পাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্প কারখানায় জেলায় প্রাপ্ত কাঁচামাল যেমন মাছ, কাঠ, অন্যান্য সামুদ্রিক কাঁচামাল, কৃষিপণ্য ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে, রাস্তা-ঘাট, বন্দর, বিদ্যুৎ, যোগাযোগসহ নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত হলেই শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই সব ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাই নিশ্চিত করে উপজেলার প্রবাসী ব্যক্তিবর্গকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা সম্ভব। উপজেলার প্রবাসী বাংলাদেশীগণ একদিকে যেমন বিনিয়োগ করতে পারবে, অন্যদিকে বাজার খুঁজে বের করতেও

পারবে। সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে পারলে এই উদ্যোগ অর্থনীতিতে বিরাট সাফল্য নিয়ে আসবে।

দর্শনীয় স্থান

বাগেরহাট জেলার গোড়াপত্তন হয়েছে প্রাচীনকালে। এই জনপদকে অতীতে কখনও বলা হয়েছে "হাবেলী কসবা", কখনও খলিফাবাদ আর বর্তমানে বলা হচ্ছে বাগেরহাট। এই প্রাচীন জনপদে আগমন ঘটেছে বহু শাসক, পীর-আউলিয়া ও মনিষীদের, যাদের অনেক কীর্তি এখনও বিদ্যমান।

খানজাহান আলীর মাজার : খাঞ্জেলি দীঘির উত্তর পাড়েই রয়েছে খানজাহান আলীর মাজার সৌধ। এটি একটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট ভবন। তিনটি দরজা এবং প্রতিটি বাহু ৪৬ ফুট করে লম্বা। এই সৌধের ভিতরে কোন স্তম্ভ নেই। চার কোণায় চারটি ছোট মিনার। কবরটি কালো পাথর দিয়ে আবৃত এবং পাথরের গায়ে আরবী ও ফার্সী ভাষায় অনেক বানী লেখা রয়েছে। এই লিপিতেই লেখা রয়েছে ১৪৫৯ সালের ২৩ শে অক্টোবর খানজাহান আলী ইন্তেকাল করেন। এই মাজারে দেশী বিদেশী বহু পর্যটক আসেন। হিন্দু মুসলিম, খ্রীষ্টানসহ সব ধর্মের লোকরাই খানজাহান অলীর মাজার জিয়ারত করেন। বিশেষ করে প্রতিবছর ২৫শে অগ্রহায়ন এই স্থানে মিলাদ মাহফিল ও ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে দূর-দূরান্ত থেকে পুণ্যার্থী সমবেত হন। এ ছাড়াও চৈত্র মাসে এখানে ভক্তদের মেলা বসে। এ ছাড়াও এ মাজারের পাশে আর একটি এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে। খাঞ্জেলি দীঘিতে রয়েছে কয়েকটি কুমির।

ষাট গম্বুজ মসজিদ : মরহুম খানজাহান আলীর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে ষাট গম্বুজ মসজিদ। মুসলিম স্থাপত্যকলার এ এক অনন্য নিদর্শন। এতে তুঘলকি রীতির প্রভাব খুবই স্পষ্ট। কথিত আছে খানজাহান আলী জৌনপুর থেকে দক্ষ নির্মাণশিল্পী আনিয়ে এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন। এত বড় ঐতিহাসিক মসজিদ বাংলাদেশে নেই। অবিভক্ত বাংলার অদিনা মসজিদ ও সোনা মসজিদের পরেই এর স্থান। এ মসজিদের পূর্ব-পশ্চিমে ৬টি করে ১০ সারিতে মোট ৬০টি স্তম্ভ এবং পুর্ব-পশ্চিমে ৭টি করে ১১ সারিতে ৭৭টি গম্বুজ রয়েছে। এর মধ্যে ৭০টি গম্বুজের উপরিভাগ গোলাকার এবং মধ্যে সারির ৭টি গম্বুজ চৌকোণা বিশিষ্ট। স্থানীয় জলবায়ুর কারণে স্তম্ভগুলো যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য মেঝে থেকে স্তম্ভগুলোর চারফুট উঁচু পর্যন্ত পাথরের আস্তরণ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। ৭৭টি গম্বুজ থাকা সত্ত্বেও এর নাম ষাট গম্বুজ বলা হয় কেন জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে ৬০টি স্তম্ভ থেকেই এই নামের উৎপত্তি। একটি ঐতিহাসিক এবং স্থাপত্যকলার নিদর্শন হিসাবে স্বীকৃতির ফলে এই স্থানের গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে। ১৯৯৩ সালে জাদুঘর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রায় ৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জাদুঘর নির্মাণ করা হয়েছে, একই সাথে দর্শনার্থীদের বিশ্রামাগার এবং থাকারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাগেরহাট টাঁকশাল : বাগেরহাটের আর এক উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি টাঁকশাল। বাংলাদেশের স্বাধীন সুতলান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে প্রাচীন খলিফাবাদ তথা আজকের বাগেরহাট শহরের এ টাঁকশাল স্থাপিত হয়েছিল এবং এর তৈরি মুদ্রা কিছু কিছু আবিস্কৃত হয়েছে, যা কলকাতা জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। সেখানে ১৫১৬-১৭ সাল এবং ১৫৩৫-৩৬ সাল অংঙ্কিত দুটি মূদ্রা রয়েছে।

মংলা : পশুর নদীর তীরে অবস্থিত মংলা বন্দর দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র-বন্দর এবং বাগের হাটের একটি দর্শনীয় স্থান।

হিরণ পয়েন্ট : সুন্দরবনের হিরণ পয়েন্ট বাগেরহাট জেলার আর একটি দর্শনীয় স্থান। মংলা বন্দর থেকে ৭৫ কিলোমিটার সুন্দরবনের মধ্যে নীলকমল খালের পাশঘেষে প্রায় সমুদ্রের কাছাকাছি এই সুন্দর পর্যটন কেন্দ্রটি অবস্থিত। সুন্দরবন উপভোগ করার ক্ষেত্রে এর তুল্য স্থান খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে বনের মধ্যে দলে দলে হরিণ চরতে দেখা যায়। ভাগ্য ভাল হলে বাঘের দেখাও মিলতে পারে। এখানকার রেস্ট হাউজে বসে

বঙ্গোপসাগরের বিস্তৃতি চোখে পড়ে। এখানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটা তিনতলা রেস্ট হাউজ আছে। আর আছে নৌবাহিনী ক্যাম্প, বনবিভাগের অফিস ও অবসর যাপন কেন্দ্র।

দুবলার চর : বাগেরহাট জেলার সুন্দরবনের অন্তর্গত দুবলার চর একটি অতি মনোরম স্থান। একদিকে রয়েছে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র এবং অন্যদিকে রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর সুন্দরবন। একে সাগরের প্রবেশ দ্বার বলা যেতে পারে। বন এবং সাগরকে উপভোগ করার ক্ষেত্রে এর জুড়ি নেই। এখানে একটি লাইট হাউজ এবং ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র রয়েছে।

জেলার দুবলা যেমন পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত তেমনি হিন্দু ধর্মের একটি তীর্থস্থান এবং বাগেরহাট জেলার সবচেয়ে বড় মেলা হচ্ছে 'দুবলার মেলা'। প্রতি বছর কার্তিক মাসে রাস পূর্ণিমার সময় এ স্থানে মেলা বসে। আবার মাঘ মাসের মকর সংক্রান্তি তথা পৌষ মাসের শেষ দিনে এখানে গঙ্গাসাগর মেলা হয়। হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও এসময় বহু পর্যটক ও অন্যান্য ধর্মের লোক আসে। ফলে সব সম্প্রদায়ের মিলনমেলায় পরিণত হয়। দুবলা মেলা উপলক্ষে এখানে নানা ধরনের দোকানপাট বসে।

কটকা : শরনখোলা থানা থেকে ৬৫ কিলোমিটার এবং মংলা বন্দর থেকে ১০৫ কি.মি. দূরত্ব এই স্থানের। পর্যটক বা ভ্রমণকারীদের বন পর্যবেক্ষণ করার সুবিধার্থে বাগেরহাট জেলার সুন্দরবনের অংশে এই স্থানে একটা অভয়ারণ্য তৈরি করা হয়েছে। পশু-পাখিদের অবাধ বিচরণ নিশ্চিত করার জন্য কটকা ও ঝাপাঞ্চল নিয়ে এই অভয়ারণ্য। সারা বছর দেশী বিদেশী পর্যটক এখানে এসে সুন্দরবনের সৌন্দর্য উপভোগ করেন। এখানে জেলা পরিষদের একটি গেস্ট হাউজ ও বন বিভাগের একটি গেস্ট হাউজ রয়েছে। কটকার অদূরেই রয়েছে টাইগার পয়েন্ট যা বাঘের সর্বাধিক বিচরণ ক্ষেত্র বলে পরিচিত।

রুদ্র মেলা : রুদ্র মেলা বাগেরহাট জেলার একটি ব্যতিক্রমধর্মী মেলা। এ মেলার প্রচলন করা হয়েছে বাগেরহাটে জন্মগ্রহণকারী সত্তর দশকের বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি অকালপ্রায়ত রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহর স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য। প্রতি বছর মাঘ মাসে তিন দিন ধরে মিঠেখালী ফুটবল খেলার মাঠে এই মেলা বসে। এই সময় মেলায় দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সাংস্কৃতিক দল একত্রিত হয় এবং তারা গান, কীর্তন, নাটক, যাত্রা ইত্যাদি উপস্থাপন করে। সেই সাথে শিশুদের আনন্দ দেয়ার জন্য আসে পুতুল নাচ ও সার্কাস।